বাঁচিবার উপায়

শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

মূল্য ১৲ এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য
স্বস্ত্যয়ন-সাহিত্য-মন্দির
মাহেশপুর (যশোহর)

কাত্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র

রায় সাহেব

শ্রীযুক্ত রামযাদু ভট্টাচার্য্য বি-এ

শ্রীচরণ কমলেষু

দাদা,

ভাল হউক···মন্দ হউক, সকলেই নিজের প্রাণের জিনিষ ভক্তি-পাত্রের চরণে উৎসর্গ করে, আমিও তাই আমার 'বাঁচিবার উপায়' আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। ইতি—

পূর্ব্বস্থলী
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

প্রণত
অনুজ

উপহার



শ্রী ---

তাং } ইতি

সাং } তোমার

ভূমিকা

(সুকবি ও সুসাহিত্যিক, ভুল, ব্যথার-সুখ, নিরক্ষরা, ঘরে-পরে প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত প্রবর শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ লিখিত।)

'বাঁচিবার উপায়' যে উপন্যাস নয়—অথবা কবিতার পুস্তক নয়—তাহার প্রমাণ তাহার নাম ঠিক জানি না—উপন্যাস্ প্লাবিত প্রেমের কবিতায় ভরা এই বঙ্গদেশে 'বাঁচিবার উপায়' বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে কিনা? কিন্তু এ-কথা খুব উঁচু গলাতেই বলিতে পারি যে—দেশের বর্ত্তমান জীবিকা-সমস্যার দিনে 'বাঁচিবার উপায়' কি তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

এ-কথা খুবই সত্য—নিছক গোলামীর উপর নির্ভর করিয়া কোন জাতি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য হয় ত' তাহাদের কণ্ঠের কাছে প্রাণের ধুক-ধুকানি থাকিতে পারে—কিন্তু তাহা ঠিক বাঁচা নয়—মরিয়া বাঁচা। বোধ হয় ইহাকেই কবি লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছেন—

"মরে বাঁচা কিছু নয়।"

(রবীন্দ্রনাথ)

জগতে যত সমস্যা আছে—তাহাদের মধ্যে অন্ন-সমস্যাই সকলের চেয়ে বড় সমস্যা। এই অন্ন-সমস্যা জাতিকে যে ভাবে কাহিল করিয়া তোলে—আর কোন সমস্যাই তাহা পারে না। বঙ্গদেশে চারিদিকে চাহিলেই বোঝা যায়—অন্ন সমস্যা কি-ভাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ ঘরের কত সোনার চাঁদ ছেলে—বেকার বসিয়া রহিয়াছে। এই যে বেকার বসিয়া থাকা—এই যে অন্ন-সমস্যা—ইহা যদি আজ বাংলা দেশে না হইয়া অন্য দেশে হইত—তাহা হইলে হাহাকারে সমস্ত দেশ ভরিয়া উঠিত। সে তীব্র আর্ত্তনাদ জাতির মেরুদণ্ড ধরিয়া এমন প্রচণ্ড নাড়া দিয়া যাইত—যে নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ আর না জাগিয়া পার পাইত না।

ভাবিবার কথা!—যখন দেশ অন্নাভাবে জীর্ণ-শীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত—সেই সময় সাধারণ (Mass) ঘুমায় কি করিয়া? ইহা কি স্বস্থের নিদ্রা—না, পীড়িতের অবসাদ? যাহাই হউক, আর তাহা শোভা পায় না। এবার জাগিতে হইবে—ও নিদ্রা ও-অবসাদকে ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। আর সেই হইবে—জাতির জাগরণ।

এই যে আমরা মরিতে বসিয়াছি—তিলে তিলে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছি—

"এ মৃত্যু ছেদিতে হবে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

ভুলিলে চলিবে না যে—আমরা—

"অমৃতস্য পুত্রাঃ"—

অমৃতের পুত্র আমরা অমর হইব; মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া পলে পলে মরিব না। জীবনের বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইতে হইবে—গরল সরল করিতে হইবে। মৃতযাচিত ভক্ষ্য—অমৃত অযাচিত দান—তুইটিরই যখন এখন একান্ত অভাব তখন প্রমৃত কৃষিই আমাদের একমাত্র জীবিকা—।

(চাষের কথা দ্রষ্টব্য)

আমরা বাঁচিব—কিন্তু কি উপায়ে—কোন পথে? তাহা ভুলিয়াই ত আজ আমাদের এই দশা! সেই বিস্মৃত উপায় সম্বন্ধে গোটা কতক কথা—'বাঁচিবার উপায়ে' পাইবেন।

মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করি যে, আমরা শিক্ষিত—আর আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার পথে দ্রুত উন্নত করিতেছি। কিন্তু যখনই শিক্ষার উদ্দেশ্যের কথা মনে পড়ে—তখনই মন-প্রাণ বিষাইয়া ওঠে। এই যে আমাদের উন্নতি—এই যে আমাদের শিক্ষার ফল—তার চরম পরিণতি কিনা চাকরি! যার নামের সঙ্গে অপমান মিশান—তাই নিয়াই গরিমা। ইহা অপেক্ষা কি জাতির পতন হইতে পারে? 'বাঁচিবার উপায়ে' এই পতিত জাতির পায়ের বেড়ি চাকরির বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ দেখিতে পাইবেন।

আমাদের গ্রাম একটি বিশিষ্ট পল্লী। স্কুল ও টোল মিউনিসিপালিটি ও থানা পোষ্ট আফিস ও ডাক্তার

খানা বাজার, হাট, ডাক বাংলা, দোকান-পসারী যাহা থাকার সবই আছে। এখানকার কর্তাগণ চাকরি করেন নাই; জমিদার প্রধান স্থান; ধারণা ছিল স্ব-বৃত্তির প্রতি মোহ এখানে এখনও তেমন ভাবে আপনার পসার-প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই—তবু কিন্তু এখানকার ভদ্রশ্রেণীর যুবকেরা স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত না হইয়া চাকরির চেষ্টায় বৃথা কাল ক্ষয় করিয়া দেশে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছেন। ইহাদের সম্মুখে দিয়াশলায়ের কলের কথা তুলিয়াছিলাম। ইহারা আমাকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। কবি কম দুঃখে গাহেন নাই যে—

"দে'শলাই কাটি তাও আসে পোতে।"

(মনোমোহন)

এই শ্ববৃত্তি যে স্ব-বৃত্তি নয় 'বাঁচিবার উপায়ে' তা' ভাল ভাবেই দেখান হইয়াছে।

বাস্তবিক ! আমাদের সমস্ত নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যই যদি পোতে আসে—আর তাহাই যদি আমাদের পয়সা দিয়া লইতে হয়—তাহা হইলে আমাদের বেকার-সমস্যা কাটিবে কিসে?

মহানুভব আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ। তিনি দেশের জন্য অনেক করিতেছেন। কিন্তু আমরা যদি স্বাবলম্বী না হই ত তাঁহার মত দুই দশজন কি করিতে পারেন? বেঙ্গল কেমিকেল তাঁহার উজ্জ্বল কীর্ত্তি-স্তম্ভ। আমাদের দেশের প্রত্যেক

যুবকেরই মনে রাখিতে হইবে—তাঁহাদের সম্মুখে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত ; সেখানে সকলকে মিলিতে হইবে। আমাদের এ জীবিকা-সমস্যার মুক্তিসাম—

"সঙ্গচ্ছধ্বং সংবদধ্বং শংবো মনাংসি জানতাম্।"

মিলিতে হইবে। মিথ্যা নয়—এ অনর্থক কথার কারদানি নয়। মিলন ব্যতীত মুক্তি নাই—

"সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে"—

আর সেই সঙ্ঘশক্তির উদ্যত উদ্যমে বেঙ্গল কেমিকেলের মত শত শত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে।

গল্প নয়—সত্যই দিয়াশলাইয়ের ব্যবসায় আমাদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। নেশার খাতিরেই হউক—আর নিত্য ব্যবহার্য্যতার জন্যই হউক একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই দেখিতে পাওয়া যায়—প্রতি বাজারে প্রত্যহ কত দিয়াশলাই বিক্রয় হয়। আর বিক্রয় লব্ধ অর্থ জাপানের, সুইডেনের ও জার্ম্মানি-ব্যাভেরিয়ার পকেট পরিপূর্ণ করে। ইহার জন্য দায়ী আমাদের নিশ্চেষ্টতা। বড়ই পরিতাপের বিষয় দেশের বার আনা লোক ইহা জানে—বুঝিতে পারে—অথচ তাহার প্রতিকার করে না। এ ব্যাধির কি ঔষধ আছে ?

প্রৌঢ় প্রবীন—যাঁহাদের রক্ত জল হইয়া গিয়াছে—তাঁহারা না হয় মধুর মৌতাতে ঝিমাইতে থাকুন। কিন্তু বাংলার তরুণগণ—দেশ এখনও যাহাদের পানে চাহিয়া দারুণ আগ্রহে অন্তিম নিঃশ্বাস রোধ করিয়া রহিয়াছে—তাঁহারা কি এখনও নেশার

খোঁয়ারি ভাঙ্গিবেন না? না,—আর নয়। ঐ যে কবির বাঁশরী বাজিয়া উঠিয়াছে—

"আগে চল—আগে চল ভাই!

*　　*　　*

জগতের সাথে যোগ দিতে হবে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

এ কথা খুবই খাটি যে আগেও চলিতে হইবে—এবং জগতের সাথে যোগও দিতে হইবে। তাহা না হইলে 'মরে বাঁচা কিছু নয়।'

বাংলার তরুণগণ, নবযৌবনে—কৈশোর আগ্রহে—যে উদ্যম—যে শক্তি—যে তেজ লইয়া কলেজ প্রবেশ করিয়াছেন—সেই তেজ—সেই উদ্যম—সেই আগ্রহ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করুন দেখি—সাধনায় সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত। চাকরিতে হইবে না। এই কথাটি পদে পদে রামহরি বাবু প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দাস হইয়া চাকর খাটিয়া উন্নতির আশা—উপরি পাওনার সাহায্যে—ইহার অপেক্ষা হাসির কথা কি হইতে পারে? রামহরি বাবু 'বাঁচিবার উপায়ে' এই কথাই প্রমাণিত করিয়াছেন—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি,
তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।"

আমাদের রাজ সেবা ভিক্ষারই নামান্তর, তাহারই সাহায্যে উন্নতি—জীবিকাসমস্যার দূরীকরণ—'নৈব চ নৈব চ।'

একটি বিষয় আমাদের ভাবিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক—এ ভিক্ষার ঝুলি আমাদের হাতে কত দিন উঠিয়াছে। খুব বেশী দিনের কথা নয়—ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে—ইসলামের হাতে যখন দেশের শাসন দণ্ড ছিল—তখনও এ ভিক্ষার ঝুলি আমাদের হাতে ওঠে নাই। তখন ছিল গোলায় ধান—গোয়ালে গরু—পুকুরে মাছ, আর ঘরে ঘরে চরকা। তখন ছিল বাংলা বহির্জগতের সঙ্গে সংশ্রব শূন্য কিন্তু জীবন-যুদ্ধের প্রতিযোগিতায় বিজিত নয় বিজেতা। আজিকার বাঙ্গালী চাকরি সর্ব্বস্ব—উদ্যমহীন জীবন্তে মরা। তবে সেদিনের বাঙ্গালী বিশ্ব সভায় যোগ দিতে পারেন নাই—বিশ্বপ্রেমের নবধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই—সে তখন ছিল আপনাকে লইয়া বিভোর—আপনার প্রেমে আপনি মস্‌গুল। বাংলা ছাড়া যেখানেই যাও—শুনিতে পাইবে—Bihar for the Bihari's. Madras for the Madrasi's কিন্তু Bengal for all (অর্থাৎ বাংলার দুয়ার সকলের জন্যই খোলা) তাই এ দেশে মায়ে তাড়ানো—বাপে খেদানো ছেলে আসিয়া রাজার আসন জুড়িয়া বসিয়াছিল—যে লোটা হাতে আসিল—তার লোটার বিনিময়ে হাতে উঠিল—লোহার সিন্দুকের চাবি। বাঙ্গালী বেগতিক বুঝিয়া সরিয়া পড়িল। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান জাতি কিনা—তাই একেবার নীতিবাক্য মাথায় তুলিয়া লইল—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ।" যাহারা দেশের যাহা দখল করিয়া বসিয়াছে—অনায়াসে তাহা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল, মিথ্যা তাহাদের পথে

দাঁড়াইয়া আত্মঘাতী হইল না। প্রসন্ন মনে তাহাদেরই দুয়ারে চাকরীর উমেদার হইয়া দাঁড়াইল। কারণ বাঙ্গালী বিশ্ব-প্রেমিক জাতি—তাহাদের কাছে আত্মপর ভেদ নাই।

কাজেই বাঙ্গালী আর কি করে—জমি জমা ভাঙ্গাইয়া খাওয়া ত আর ভদ্রলোকের কাজ নয়। বুদ্ধিমান ভদ্রলোক বাঙ্গালী অগত্যা চাকরিই স্বীকার করিল। কিন্তু সে চাকরির দশাই বা দিন দিন কি রকম হইয়া উঠিতেছে? এইবার কি বুদ্ধিমান বাঙ্গালীরা Adventureএর শরণাপন্ন হইবেন। ফিরিবার যুগ আসিয়াছে। এ সময়ে 'বাঁচিবার উপায়ে'র যে কোনও উপায় অবলম্বন করিলে বাঁচিয়া যাইবেন ত বটেই—তা' ছাড়া দেশের মুক্তিদূতের একজন হইয়া ভবিষ্যৎ বংশধরগণের কাছে নিজের একটা প্রতিষ্ঠা রাখিয়া যাইতে পারিবেন।

জাতির আকাশেও শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ আছে। কোনও জাতি কখনও চিরদিন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়া হাসিয়া ওঠে না; অথবা কোনও জাতি—কখনও চিরকাল অমাবস্যার নিছক অন্ধকারে ডুবিয়া মরে না। হাসি কান্না সকল জাতিরই জীবনে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে। তবে আমরা অবসাদে কেন মিথ্যা জীবনকে পক্ষাঘাত গ্রস্ত করি। ইটালি মরিয়াছিল—কিন্তু আমাদেরই চক্ষুর উপরে নবজীবন লাভ করিয়াছে, জাপান দেখিতে দেখিতে কত উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, বেশী দিনের কথা নয়—যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণ শিল্প প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু কত অল্প দিনের মধ্যে তাহা আবার ভারতের বাজার ছাইয়া

ফেলিয়াছে। এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিলে স্বতঃই মনে হয়—

"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমি-ক্রমেণ।"

(কালিদাস)

চক্রনেমিক্রমে ভারতের তথা বাংলার এই দুর্দ্দশার চাকা উল্টাইলেই যে দশা ভাল হইবে না—তাহা কে বলিতে পারে? সেই চাকা উল্টাইবার কয়েকটি উপায়—এই 'বাঁচিবার উপায়ে' রামহরি বাবু আমাদের বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরিয়াছেন।

'বাঁচিবার উপায়ে'র কয়েকটি প্রবন্ধ আমার সম্পাদিত মাসিক পত্র 'স্বস্ত্যয়নে' বাহির হইয়াছে তখন আমার মনে হইয়াছিল—আমি হয় ত আমার কাগজের মায়ায় প্রবন্ধগুলির ও লেখকের উপর অবিচার করিতেছি। কারণ স্বস্ত্যয়ন সাধারণের স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আর 'বাঁচিবার উপায়ে'র প্রবন্ধ গুলি সাধারণের জন্যই লিখিত। তবু আমি মনে মনে এইটুকু গর্ব্ব অনুভব করি যে, এই শক্তিমান লেখককে আমিই সাহিত্যের আসরে নামাইয়াছি।

'বাঁচিবার উপায়ে' জমিদার ও প্রজার যে মিলনের প্রয়াস আছে—বাস্তবিক আমাদের এই অধঃপতিত দেশকে যদি বাঁচিতে হয়— তাহা হইলে তাহার একান্ত আবশ্যক। এখন আর আমাদের পরস্পর অসহযোগ করিবার দিন নাই—সহযোগের সময় আসিয়াছে। এখন জমিদার ও প্রজার সহযোগিতা ব্যতীত দেশকে উন্নত করিয়া তোলা অসম্ভব। কারণ লক্ষ্মীর কৃপা—জমিদারের ভাণ্ডারে—আর কর্ম্মের ক্ষমতা কৃষাণের যন্ত্রে। এই

দুইটীকে যদি আমরা সম্মিলিত না করিতে পারি—তাহা হইলে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই—ভস্মে ঘৃত ঢালার মত ব্যর্থ হইবে।

বাংলা নদী-মাতৃক দেশ। কৃষকের কাজ এখানে যত সহজ সাধ্য—অন্য কোনখানে তত নয়। অথচ দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের কৃষকের ঘরে অন্ন নাই।

"অন্নোবৈ প্রাণাঃ"

সেই অন্নময় কোষকে ত উপেক্ষা করা চলে না। অন্নাভাবে সকলের দেহ ক্ষীণ—বাহু শক্তিহীন, কেন এমন হয়?

কোনও ইংরাজকে প্রশ্ন করা হয়—ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য কি? সে অনায়াসে উত্তর দিয়াছিল—"দুর্ভিক্ষ"। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ ভারতের সহজ নয়। আমরাই আমাদের এই অসহজ দুর্ভিক্ষকে ডাকিয়া সাধিয়া নিজের জীবনের সঙ্গে বিজড়িত করিয়াছি। নতুবা যে দেশের গাছের মাথায় দুই টুকরা অন্ন ও এক গ্লাস জল আছে—যে দেশ আপনার বুককে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—আর ডাকিয়া বলিতেছে—রত্নে ভাঁড়ার ভরা আছে —তোমরা কেবল তুলিয়া লও। যে দেশের অন্ন অদূর কাবুল হইতে সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত লুটিয়া খাইতেছে—সেই দেশের লোক অন্নাভাবে মরে—ইহা অপেক্ষা লজ্জার কারণ কিছু আছে। মরিবে না কেন? যদি সাধিয়া মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা হয়—সে দোষ কাহার?—অন্যের ত নয়?

সূত্রধর রজক প্রভৃতি সকলেই স্কুলে যায়। মন্দ নয়। কারণ আমাদের দেশে শিক্ষিতের গড় খুবই কম। তাহা কিছু

বাড়াইবার আবশ্যক আছে। জন সাধারণকে শিক্ষিত করিতে না পারিলে স্বরাজ পাওয়ার আশা সুদূর পরাহত। কিন্তু তবু যখনই দেখি—সূত্রধর স্কুলে গিয়াছে—তাহার ব্যবসায়ের জন্য নয়—'টাটায়' একটি চাকরি পাওয়ার আশায়—তখনই আমার চোখ টাটাইয়া ওঠে। আরও মর্ম্মাহত হই—যখন জানিতে পারি, রজক ইংরাজী শিক্ষা করিতেছে—রঞ্জনের নব উপায় আবিষ্কারের জন্য নয়—হিরাপুরে একটি চাকরি লাভের বাসনায়। ইহারা একবার চাহিয়াও দেখে না—যে, আজকাল কত ভদ্রলোক (B.A,—M,A.) এই ব্যবসায়ে জীবিকা সমস্যার সমাধান করিতেছেন! বাঁচিবার উপায়ের গল্পগুলি হয়ত ঘোরালো বা কলা সম্মত নয়। কিন্তু সকলেই যেন মনে রাখেন 'বাঁচিবার উপায়ে'র বক্তব্য গল্পাংশ নয় বক্তব্য প্রতিপাদ্য বিষয়। তবে প্রবন্ধগুলি পাঠ অর্থাৎ Taskভাবে না লিখিয়া সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য এইভাবে লিখিত হইয়াছে।

যাক ধান ভানিতে আর মহীরাবনের গীত গাহিব না। সকলের শেষে এই কথাটি বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করি—রামহরি বাবুর পুস্তকের তুলনা—রামহরি বাবুর পুস্তকেই—ঠিক যেমন গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা।

'বাঁচিবার উপায়' পাঠ করিয়া অন্ততঃ একজন যুবকও যদি বাঁচার মত বাঁচিবার চেষ্টা করেন—স্বাবলম্বী হইয়া—নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ান—তাহা হইলে লেখক ও প্রকাশকের যত্ন সার্থক হইবে। ইহার অধিক আশা তাঁহাদের নাই।

"ব্রজ-ধাম"
মাহেশপুর
যশোহর।

বাসন্তী পঞ্চমী
১৮ই চৈত্র, ১৩৩১ সাল।

বাঁচিবার উপায়

— ১ —

বঙ্গদেশে মৃত্যু সংখ্যা ভয়াবহ হইয়াছে তাহা আদমসুমারীর রিপোর্ট হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং এরূপভাবে চলিলে দেশ উচ্ছন্ন যাইবে তাহা উপলব্ধি করিয়া অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে আমাদের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা উক্ত রিপোর্টে বুঝা যায় না। তাহাতে বিদেশীয় বা ভিন্ন প্রদেশীয়দিগকেও ধরা হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে বহুসংখ্যক কল-কারখানা স্থাপিত থাকায় ও নানাস্থানে রেলবিস্তার হেতু বাঙ্গলার বাহিরের বহু কুলি মজুর ইত্যাদি বাস করিতেছে। ব্যবসায় বাণিজ্যে দিন দিন পশ্চিমা ও মাড়োয়ারীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বিদেশীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ ও বেহারা, উড়িয়া চাকর, মালী ও পাচক সুদূর

পূর্ব্ববঙ্গকেও ছাইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে কেবলমাত্র কলিকাতায় অল্পসংখ্যক উড়িষ্যাবাসী দৃষ্ট হইত। সুতরাং উপরোক্ত রিপোর্ট হইতে বাঙ্গালীর প্রকৃত অবস্থা বুঝা কঠিন। যদি বাঙ্গালীর প্রকৃত অবস্থা কেহ বুঝিতে ইচ্ছা করেন তবে একবার নিজ নিজ পল্লীগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখুন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পল্লীগুলিতে যত লোক সংখ্যা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার অর্দ্ধেক দেখিবেন। ঐ সকল লোক যে সকলেই মরিয়া গিয়াছে তাহা নহে, তবে অধিকাংশই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে এবং কতক, স্থান ত্যাগ করিয়া সহরে গিয়া বাস করিতেছে। স্বাস্থ্যহীনতাই ইহার কারণ, ইহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট দেশের স্বাস্থ্যের কথা এবং তাহার প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে অর্থাভাবের দোহাই দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করা হয়। তবে আমাদের বাঁচিবার কি কোন উপায় নাই? গবর্ণমেণ্ট যদি কিছু না করেন তাহা হইলে আমরা কি নির্ব্বাক হইয়া মরিতে থাকিব? আমাদের নিজের কি কোন শক্তি নাই?

সর্ব্বশ্রেণীর নেতাগণের নিকট আমার একটী প্রার্থনা জানাইতে ইচ্ছা করি তাঁহারা দেশকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করুন এবং আমার নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন।

ফ্রান্স জার্ম্মানী প্রভৃতি সুসভ্য দেশে বিশিষ্ট লোক-হিতকর কার্য্যের জন্য কতকগুলি বণ্ড (Bond) বাহির করা হয়

এবং লটারী করিয়া ক্রমে ক্রমে বণ্ডগুলি পরিশোধ করা হয়। আমরা যদি সমস্ত পল্লীগুলির স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বণ্ড বাহির করি তাহাতে ক্ষতি কি? একশত কোটি টাকার বণ্ড বাহির করিলে এবং প্রত্যেক বণ্ডের মুল্য ২৫৲ টাকা ধার্য্য করিলে চারি কোটি বণ্ড বাহির হইবে। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে যে বণ্ড বাহির হয় তাহার মূল্য প্রায় দশ কি পনর পাউণ্ডের কম হয় না। কিন্তু আমাদের এই গরীবদেশে এইরূপ মূল্যের বণ্ড খরিদ করিবার লোক খুব কম। এমন কি ঐ ২৫৲ টাকার মূল্যের বণ্ডের টাকা তিন কি চারি কিস্তিতে লওয়া সুসঙ্গত হইবে। আশা করি এইরূপ জনহিতকর কার্য্যে টাকার অভাব হইবে না। বণ্ডগুলি সমস্ত বিক্রয় হইয়া যাইলে একশত কোটী টাকা আমাদের হস্তগত হইবে এবং টাকাগুলি কয়েকটি বিশ্বাসী ও প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক বা লোন অফিসে জমা রাখিতে হইবে। অনেকগুলি ব্যাঙ্কে টাকাগুলি ছড়াইয়া রাখিলে টাকা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। টাকা ব্যাঙ্কে রাখিলে শতকরা ছয় টাকা সুদ আমরা পাইতে পারিব এবং তদ্বাবদ আমাদের হাতে প্রত্যেক বৎসর ছয়কোটি টাকা আসিবে। এই টাকার মধ্যে এককোটি টাকা বণ্ড পরিশোধের জন্য ব্যয় করিয়া বাঁকি পাঁচ কোটি টাকা যদি পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য খরচ করা হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর বহু পল্লী মৃত্যুর ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারে।

যে পল্লীগুলির স্বাস্থ্য অধিকতর শোচনীয় সেইগুলিতেই

প্রথম হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হইবে। স্বাস্থ্য হিসাবে পল্লীর শ্রেণী বিভাগ করিয়া লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। কোনগুলিতে কোন রকম কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে তাহা লটারী দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। যে সকল পল্লীতে অধিক সংখ্যক বণ্ড বিক্রয় হইয়াছে এবং স্বাস্থ্যও মন্দ সেইগুলির দাবী অগ্রগণ্য ধরিয়া লটারী করিতে হইবে।

প্রত্যেক বর্ষের শেষে যে এককোটি টাকা বণ্ড পরিশোধের জন্য দেওয়া হইবে তাহা নিম্নলিখিত ভাবে লটারী দ্বারা বিতরণ করা আবশ্যক। লটারী দ্বারা টাকা দিলে পৃথিবীর সকল স্থানের লোকই বণ্ড লইতে পারেন। যাঁহারা মাত্র ২৫৲ টাকা দিয়া বণ্ড লইবেন তাঁহারা ঊর্দ্ধ সংখ্যা তুইলক্ষ টাকা পর্য্যন্ত পাইতে পারেন। একবার টাকা দিয়া চিরদিনই টাকা পাইবার আশা থাকিবে। তিনি বা তাঁহার পরবর্ত্তীগণের মধ্যে কেহ টাকা পাইবেনই। তবে ভাগ্য অনুসারে কম বেশী হইতে পারে। এইরূপ হিতকর কার্য্যে দান ও সঙ্গে সঙ্গে মোটা টাকা পাইবার আশা থাকিলে আমাদের প্রয়োজনানুরূপ টাকা পাইতে বাধা হইবে না।

প্রথম পুরস্কার	...	২০০০০০৲
দ্বিতীয় পুরস্কার	...	১০০০০০৲
তৃতীয় পুরস্কার	...	৫০,০০০৲
চতুর্থ পুরস্কার	...	২০,০০০৲
পঞ্চম পুরস্কার	...	১০,০০ ৲

৫০০০৲ হিঃ ২টি পুরস্কারের টাকার পরিমাণ		১০,০০০৲
৪০০০/ হিঃ ৩টী	...	১২০০০৲
৩০০০৲ হিঃ ৪টী	...	১২০০০৲
২০০০৲ হিঃ ৫টি	...	১০,০০০৲
১০০০ হিং ৬টি	...	৬০০০৲
৯০০৲ হিঃ ৭টি	...	৬৩০০৲
৮০০৲ হিঃ ৮টি	...	৬৪০০৲
৭০০৲ হিঃ ১০টি	...	৭০০০৲
৬০০৲ হিঃ ১৫টী	...	৯০০০৲
৫০০৲ হিঃ ২০টী	...	১০,০০০৲
৪০০৲ হিঃ ৫০টী	...	২০,০০০৲
৩০০৲ হিঃ ১০০টী	..	৩০,০০০৲
২০০৲ হিঃ ৫০০টী	...	১০০০০০৲
১০০৲ হিঃ ৬৩১৩টী	...	৬৩১৩০০৲
৫০৲ হিঃ ১৭৫০০০টী	...	৮৭৫০০০০৲
১৮২০৪৮টী পুরস্কার		১০০০০০০০৲

এইরূপ প্রতি বৎসর ১৮২০৪৮টী পুরস্কার বণ্ডের গৃহিতাগণের মধ্যে বিতরণ করা হইবে এবং যাঁহারা কোন পুরস্কার পাইবেন তাঁহাদের বণ্ড পরিশোধ হইল বুঝিতে হইবে এবং তাঁহারা তাঁহাদের বণ্ড ফেরত দিয়া পুরস্কারের টাকা লইয়া যাইবেন। নিরূপিত সময়ের মধ্যে টাকা গ্রহণ না করিলে পুরস্কারের টাকা সাধারণ ফণ্ডের মধ্যে গচ্ছিত ভাবে রাখা হইবে।

বণ্ড গৃহিতাগণ তাহাদের বণ্ড হস্তান্তর করিতে পারিবেন কিন্তু যিনি খরিদ করিবেন তিনি তাঁহার নাম পত্তন করিয়া লইবেন ও নাম পত্তনের ফি ১৲ হিঃ দিবেন। বণ্ড গৃহিতা স্বয়ং বা তাঁহার অভাবে তাঁহার 'নমিনী' (Nominee) পুরস্কারের টাকা পাইবেন। প্রত্যেক বণ্ডের জন্য একজন মাত্র 'নমিনী' নিযুক্ত হইতে পারিবে। বণ্ড গৃহিতা বা বণ্ড ক্রেতা যদিচ্ছা 'নমিনী' (Nominee) পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন সে জন্য প্রত্যেকবার ॥৹ হিঃ ফি দিতে হইবে। বণ্ড ক্রেতা তাঁহার নাম পত্তন করিয়া লইবার পূর্ব্বে যদি সেই নম্বর পুরস্কার নির্দ্ধারিত হয় তবে তাহা পাইতে পারিবেন না। বণ্ড গৃহীতা বা তাঁহার 'নমিনী'কে উক্ত পুরস্কারের টাকা দেওয়া হইবে। বণ্ডের দরখাস্তের সঙ্গে নমিনীর নাম দিতে হইবে এবং তজ্জন্য কোন ফিঃ দিতে হইবে না। পুরস্কার বিতরণের সময় বণ্ড গৃহিতা বা তাঁহার নমিনীকে যদি জীবিত না পাওয়া যায় তবে উক্ত পুরস্কারের টাকা সাধারণ ফণ্ডে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইবে। মূল স্বত্বাধিকারীর মৃত্যু হইলে 'নমিনী' আপন নাম পত্তন করিয়া নিজের 'নমিনী' নিযুক্ত করিয়া লইবেন ও তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত ফি আট আনা দিতে হইবে। বণ্ড ক্রেতা বা 'নমিনী' আপন নাম পত্তন করিয়া লইলে তাহাকে বণ্ড গৃহিতা বলিয়া ধরা হইবে। বণ্ড বিক্রীত হইলে মূল গৃহিতার 'নমিনী'র কোন দাবী চলিবে না।

প্রত্যেক বণ্ড গৃহিতাই মেম্বর হইবেন। প্রত্যেক

থানার মেম্বরগণের মধ্য হইতে একজন করিয়া সহকারী ডাইরেক্টর নিযুক্ত করা হইবে এবং মেম্বারগণই সহকারী ডাইরেক্টর নির্ব্বাচিত করিবেন। সহকারী ডাইরেক্টরগণের দ্বারা জেলাকমিটি গঠিত হইবে ও তাঁহারাই সেই সেই জেলার কার্য্য পরিচালন করিবেন। সহকারী ডাইরেক্টরগণের মধ্য হইতে প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া ডাইরেক্টর নির্ব্বাচিত করিতে হইবে এবং সে কার্য্য সহকারী ডাইরেক্টরগণই সম্পাদন করিবেন। এইরূপ নির্ব্বাচিত ডাইরেক্টর দ্বারা 'বোর্ড অব্ ডাইরেক্টরস্' গঠিত হইবে ও তাঁহারাই বাঙ্গলার সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করিবেন।

প্রত্যেক জেলার কার্য্যভার জেলা কমিটীর হস্তে থাকিবে এবং প্রত্যেক পল্লীর কার্য্যভার সেই সেই গ্রামের মেম্বরগণের উপর ন্যস্ত করা সুসঙ্গত। মেম্বরগণ তাঁহাদের কৃতকার্য্যের জন্য জেলা কমিটীর নিকট এবং জেলা কমিটী তাঁহাদের কার্য্যের জন্য 'বোর্ড অব্ ডাইরেক্টরস্'এর নিকট দায়ী থাকিবেন।

যে সকল পল্লীতে কার্য্য আরম্ভ হইবে সেইস্থানের মেম্বরগণের করণীয় বিষয়ের ও 'হাইজিন' সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ পুস্তিকা ছাপাইয়া এক একখানি তাহাদের মধ্যে বিতরণ করা আবশ্যক হইবে, কার্য্য ঠিক হইতেছে কি না তাহা ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তারগণ পরিদর্শন করিয়া দেখিবেন ও তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবেন।

যে সকল পল্লীতে কার্য্য আরম্ভ হইবে সেই সেই পল্লীর মধ্যে স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার কারণ ও তাহার প্রতিকারের

উপায় সম্বন্ধে প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া লইতে হইবে এবং একটি 'এষ্টিমেট্‌' প্রস্তুত করিয়া 'বোর্ড অব্‌ ডাইরেক্টরস্‌' হইতে মঞ্জুর করাইয়া লইতে হইবে।

পল্লীর জঙ্গল পরিষ্কার, গ্রাম্য পথগুলি সমুন্নত ও পাকা করা, পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা, জল নিকাশের ব্যবস্থা করা, পুরাতন পুষ্করিণী ও ডোবাগুলি সংস্কার বা ভরাট করা, চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা এবং নদী সংস্কার প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক ক্রমে ক্রমে ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লীবাসিগণ যাহাতে রোগের প্রতিকারের উপায়গুলি সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারেন ও পালন করিতে সক্ষম হন তজ্জন্য উপদেশপূর্ণ পুস্তিকা ছাপাইয়া বিতরণ করা আবশ্যক হইবে।

এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যদি কোন আইন প্রণয়নের আবশ্যক হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ব্যাঙ্কের নিয়মানুসারে যে যে সময়ে সুদ উঠানর নিয়ম থাকিবে সেই সেই সময়ে উঠাইয়া প্রয়োজনের সময় পাইবার সর্ত্তে পৃথকভাবে 'ডিপজিট' করিয়া রাখিলে যে সুদ পাওয়া যাইবে তাহা সামান্য হইবে না। তদ্দ্বারা বাজে খরচ অনেকাংশ চলিয়া যাইবে। তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

আমার প্রস্তাব বাতুলের প্রলাপ বলিয়া মনে হইলেও দেশের মানিষীগণকে একবার বিবেচনা ও চেষ্টা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। যদি ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর না হয় তবে আংশিকভাবে পারিলেও সেই পরিমাণে

পল্লীগুলি রক্ষা পাইতে পারে। এই কার্য্যের দ্বারা পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি ব্যতীত বহু লোকের অন্নষ্ট সংস্থান লইয়া দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

— ২ —

সাধারণের বিশ্বাস যে জমিদারগণ প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে এ বিষয় লইয়া সভা-সমিতিও হইতেছে। কিন্তু জমিদার-পক্ষকে বাদ দিয়া কোনও কার্য্য করিলে সে কার্য্য সুসিদ্ধ হওয়া কতদূর সম্ভবপর তাহা তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখেন না। জমিদারগণের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনই ন্যায়-বিগর্হিত কাজে মত দিতে পারেন না। জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাগণকে উত্তেজিত করা হইতেছে, ইহা বর্ত্তমান দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ কার্য্য স্বরাজ-লাভের পরিপন্থী বলিয়াই মনে হয়। প্রজাগণকে উত্তেজিত করিবার পূর্ব্বে কোন জমিদারীতে প্রজাগণের কি কি সুবিধা আছে বা কি কি অসুবিধা আছে তাহা দেখা আবশ্যক।

জমিদারগণ বর্ত্তমানে আর প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নহেন, কেবল গবর্ণমেণ্টের তহশীলদার মাত্র। এই কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু মুনফা পাইয়া থাকেন। সকল জমিদারই যে প্রজাপীড়ন করিয়া থাকেন ইহা ধরিয়া লওয়া সুসঙ্গত নহে।

কোন্ কোন্ জমিদার কি ভাবে প্রজাপীড়ন করেন তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া তবে প্রজাকে উত্তেজিত করা উচিত। অনেক সহৃদয় জমিদার আছেন, যাঁহারা প্রজাকে অনেক বিষয়ে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ অনুগ্রহ প্রজা অনুগ্রহ বলিয়া মনেই করেন না। অনেক জমিদারের মধ্যে বিনা সুদে তামাদি কাটিয়া দিলে আর নালিশ করা হয় না। কিন্তু সেই সকল স্থানের জমিদার যদি সুদের দাবী করেন, তবে প্রজা মনে করিবে জমিদার অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। অনেক স্থলে তামাদি না হইলে নালিশ করা হয় না। কিন্তু জমিদারকে কিস্তি কিস্তি Revenue দিতে হয়। জমিদার যদি কিস্তি কিস্তি নালিশ করিতে আরম্ভ করেন তবে প্রজা বলিবে জমিদার আমাদের কষ্ট দিবার জন্য কিস্তি কিস্তি নালিশ করিতেছেন। সুবিধা পাইলে প্রজাও যে জমিদারকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে না তাহা নহে। জমিদারের খাস পতিত জমি জমাভুক্ত করিয়া লইয়া জমিদারের ন্যায্য প্রাপ্য ফাঁকি দেওয়া প্রজাগণের মধ্যে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। 'সেট্‌ল্‌মেণ্টে'র সময়ে প্রজা-স্বত্ব আইনের ৫০ (২) ধারা, মত জমা মোকররি করার চেষ্টার ত্রুটি বোধ হয় কোনও প্রজাই করেন নাই। ঐ সকল বিষয়ের প্রতিকার চেষ্টা যদি জমিদার করেন তবে প্রজাপীড়ন হইল বলিয়া অনেকেই হৈ চৈ করিতে থাকিবেন। মোট কথা বিরোধ বাঁধান খুবই সহজ কিন্তু পরস্পরের সহিত মিলন সঙ্ঘটন করা সহজ-সাধ্য নহে এবং সে সম্বন্ধে কেহ বড় চেষ্টা করিতেছেন না।

জমিদারের সহিত বিরোধ করিয়া প্রজার পারিয়া উঠা সুকঠিন, জমিদার যদি কিস্তি কিস্তি নালিশ করিতে থাকেন তবে প্রজার বাঁচিবার উপায় কি আছে? ক্ষুদ্র একটি জমায় নালিশ হইলে ডিক্রীজারির খরচ পর্য্যন্ত অন্ততঃ ২০৲ কুড়ি টাকা খরচ পড়িবে। এইরূপ প্রজা যদি পাঁচটি জমা রাখে তবে সেই প্রজা ঐ জমাগুলি কিরূপে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে? কিস্তি কিস্তি খাজনা মিটাইয়া দেওয়া কয়টি প্রজার ক্ষমতায় কুলায়? হইতে পারে দুই একটি অবস্থাপন্ন প্রজা হয় ত কিস্তিমত Rent money order করিলেন অথবা কোর্টে কিস্তি কিস্তি টাকা দাখিল করিলেন—কিন্তু তাহাও বিনা' খরচায় হয় না। কোর্টে টাকা দাখিল করিতে দরখাস্ত, নোটীশজারির রোজ, ওকালতনামা, উকিল ফি ও কোর্টের মহাপ্রভুদের প্রণামী দিতে হয়। উপরন্তু কোটীশজারির পূর্ব্বেই যদি জমিদার নালিশ করিয়া বসেন তবে প্রজাকে নালিশের খরচার জন্যও দায়ী হইতে হয়। Rent money order যদি জমিদার গ্রহণ না করেন তবে পিয়ন রীতিমত ভাবে বিলি করিতে গিয়াছে ও জমিদার তাহা লইতে অস্বীকার করিয়াছেন তাহা প্রমাণ করা প্রজার পক্ষে সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে। মোট কথা প্রজাই জমিদারের নিকট ঋণী হইবেন, জমিদার ত' প্রজার নিকট ঋণী হইবেন না। আমার বিবেচনায় প্রজাকে জমিদারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া প্রজার হিত সাধন হইবে না পরন্তু প্রজা ভূম্যধিকারীর মধ্যে যাহাতে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয় তাহা

করিতে পারিলে ও পরস্পরের অভাব—অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।

বর্ত্তমানে জমিদারগণের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বড় কাহারও অবিদিত নাই। এক্ষণে প্রজা ধরিয়া আনিয়া টাকা আদায় করার উপায় জমিদারের নাই। এরূপ করিলে প্রজা ফৌজদারী করিতে শিখিয়াছে। আমি বলিতেছি না। যে সকল প্রজাই চালাক হইয়াছে কিন্তু প্রত্যেক গ্রামেই দুই একটি যে চাঁই নাই—তাহা নহে। তাহারা মাতব্বর সাজিয়া অজ্ঞ প্রজাগণকে মোকর্দ্দমা করিতে উৎসাহিত করে এবং মোকর্দ্দমা রুজু হইলে তদ্বিরের ভার গ্রহণ করিয়া নিজের উদর পূরণ করিয়া থাকে। তাহারা প্রজার হিত অপেক্ষা নিজের হিতটাই অধিক দেখিয়া থাকে। এক্ষণে বাঁকিদার প্রজার নিকট খাজনা আদায়ের একমাত্র পন্থা আদালতের হাত দিয়া। নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে অনেক টাকা ঘর হইতে বাহির করিতে হয়। কিন্তু প্রজা যদি ইচ্ছা করে তবে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত ঘুরাইয়া আনিতে পারে। তাহাতে প্রায় চারি বৎসর কাটিয়া যায়। পক্ষান্তরে জমিদারকে কিস্তি কিস্তি রাজস্ব দিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া জমিদারকে প্রয়োজনীয় খরচগুলি চালাইতেই হয়, মোকর্দ্দমা মুলতুবি অবস্থায় সুদ প্রায়ই পাওয়া যায় না। কিন্তু জমিদারের হ্যাণ্ডনোটের টাকার সুদ চলিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে আসল মোটা

হইয়া দাঁড়াইলে একটি সম্পত্তি বন্ধক দিতে হয়। ঐরূপে কতকগুলি মোকৰ্দ্দমা অনেকদিন মুলতুবি থাকিলে, ক্রমে সুদে আসলে ফাঁদিয়া উঠে। পক্ষান্তরে প্রজাকে অনেক দিনের আর খাজনা দিতে হয় না। তাহাতে এই ফল হয় যে জমিদারের নিকট প্রজার দেনাও মোটা হইয়া যায়। ইহার ফলে প্রজা ও ভূম্যধিধিকারী উভয়েরই পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া যদি দেখা যায় তবে সকলেই বুঝিবেন যে জমিদারগণ প্রজার সহিত প্রীতি-বন্ধনে বদ্ধ হইতে যে চাহিবেন না তাহা নহে। যাহাতে প্রীতিবন্ধন স্থায়ী ও দৃঢ় হয় এবং দেশ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায় অথচ দেশের কর্ত্তৃত্ব জমিদার ও প্রজাসাধারণের হাতে আসে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি একটী প্রস্তাব নিম্নে বিবৃত করিলাম। সহৃদয় জমিদারগণ ও চিন্তাশীল প্রজাগণ এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিলে আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইব।

পরস্পরের মধ্যে একটা আপোষ করিতে হইলে উভয় পক্ষকেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। কোনও গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে একটী ধন ভাণ্ডারেরও আবশ্যক, সেজন্য জমিদার ও প্রজাকে কিছু কিছু অর্থদান করিতে হইবে।

১। (ক) প্রজা জমিদারের যে সকল জমির কর ফাঁকি দিয়া ভোগ করিতেছেন তাহার ন্যায্য কর দিবেন। অর্থাৎ যে হারে অন্যান্য প্রজা কর দিয়া থাকেন, সেই হারে সকল জমির উপর কর নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

(খ) জমিদার নিরিখ বৃদ্ধি করিবেন না ও প্রজার হস্তান্তরে অধিকার দিবেন এবং ইমারত গঠনে বা পুষ্করিণী খননে বাধা দিবেন না। হস্তান্তরের জন্য একটা সঙ্গত নজর জমিদার পাইবেন।

২। প্রজা যত টাকা খাজনা দেন তাহার উপর প্রতি টাকায় এক আনা হিসাবে দিবেন ও জমিদার যত টাকা মুনফা পান তাহার উপর প্রতি টাকা এক আনা হিসাবে দিবেন। এই উভয় টাকায় একটি ধন ভাণ্ডার স্থাপিত করিতে হইবে এবং উহা কয়েকটি প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কে বা লোন্ অফিসে জমা রাখিতে হইবে। ঐ টাকার অর্দ্ধেক পরিমাণ স্থায়ী ভাবে রাখিতে হইবে। ঐ টাকার সুদ যাহা পাওয়া যাইবে ও বাঁকি অর্দ্ধেক টাকার দ্বারা নিম্নলিখিত জনহিতকর কার্য্যগুলি করিতে হইবে।

(ক) প্রত্যেক পল্লীর রাস্তাগুলি সমুন্নত ও পাকা করা।

(খ) জল নিকাশের ব্যবস্থা করা।

(গ) পানীয় জলের সংস্থান করা।

(ঘ) চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা।

(ঙ) জঙ্গল পরিষ্কার করা।

(চ) স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ পুস্তিকা ছাপাইয়া প্রজা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা।

(ছ) প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা করা।

(জ) পুরাতন পুষ্করিণী ও ডোবাগুলির সংস্কার বা ভরাট করা।

উক্ত 'ফণ্ডটি' একটি 'প্রভিন্সিয়াল কমিটি'র হস্তে দিতে হইবে। প্রত্যেক ডিভিসন হইতে দুইজন করিয়া সভ্য লইয়া এই কমিটি গঠিত করিতে হইবে। ঐ দুইজন সভ্যের মধ্যে একজন জমিদার থাকিবেন ও আর একজন শিক্ষিত প্রজার মধ্য হইতে গৃহীত হইবেন। প্রত্যেক থানা হইতে দুইজন করিয়া সভ্য লইয়া জেলা-কমিটি গঠন করিতে হইবে। ইহার মধ্যেও অর্দ্ধেক থাকিবেন জমিদার বা তাঁহার প্রতিনিধি এবং অর্দ্ধেক থাকিবেন শিক্ষিত প্রজা। প্রত্যেক জমিদারী বা তালুকদারীর মধ্যে এক একটি 'সব' বা গ্রাম্য কমিটি থাকিবে। তাহাতে দশ জন করিয়া সভ্য থাকিবেন! তাহারও অর্দ্ধেক শিক্ষিত প্রজার মধ্য হইতে লইতে হইবে। অর্দ্ধেক জমিদার বা তালুকদার নির্ব্বাচিত করিয়া দিবেন। এই সমস্ত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা প্রজার পক্ষে নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক গ্রামের শিক্ষিত ও মাতব্বর প্রজাগণ নির্ব্বাচন করিবেন। সমুদয় সব কমিটির মেম্বর গণও তাহাদের মধ্য হইতে জেলা কমিটির সভ্যগণকে নির্ব্বাচিত করিবেন ও জেলা কমিটির সভ্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রাদেশিক কমিটির সভ্য বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন। 'সাব কমিটি জেলা কমিটির অধীন হইবে এবং জেলা কমিটি প্রাদেশিক কমিটি'র অধীন হইবে।

সকলে হয়ত বলিবেন লোকে খাইতে পাইতেছে না, আর এইরূপ ভাবে টাকা কি প্রকারে দিবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে—লোকে খাইতে পাইতেছে না, অধিক মূল্য

দিয়া খদ্দর কিনিয়া পরিবে কি প্রকারে ? আসল কথা হইতেছে যে স্থায়ী ভবিষ্যৎ উন্নতি বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এই টাকা কি প্রজা কি জমিদার সকলেরই দেওয়া কর্ত্তব্য। জমিদার যদি টাকায় এক আনা দেন তবে তাঁহার আয়ের ষোল ভাগের এক ভাগ দিতে হইবে। কিন্তু জমিদার মোকর্দ্দমা করিয়া যে টাকা ব্যয় করেন তাহা যদি তাঁহাকে না করিতে হয়, দেশের যদি স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে তবে সহরে বাস না করিয়া স্বগ্রামে বাস না করিলে যে টাকা বাঁচিয়া যাইবে এবং সর্ব্বোপরি ইহার দ্বারা দেশের যে অশেষ হিত সাধন হইবে, তদ্বিষয়ে একটু বিবেচনা করিলে, অনর্থক টাকা দিতেছেন না তাহা বুঝিতে পারিবেন। প্রজাগণ হিসাবান বা পার্ব্বনী-হিসাবে জমিদারের গোমস্তাকে এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। অতএব ইহা তাহাদের পক্ষে নূতন কিছুই হইবে না। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে প্রজাপক্ষের ইহাতে বলিবার কিছুই নাই; "যেহেতু তাঁহাদের বহাঘাড়" অধিকন্তু ইহার দ্বারা তাঁহাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

উপরোক্ত ফণ্ডের টাকা হইতে অর্দ্ধেক পরিমাণ স্থায়ীভাবে পৃথক রাখিয়া প্রতি বৎসর অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা পল্লীর উন্নতি সাধনের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। অর্দ্ধেক অংশ যাহা রাখা হইবে তাহা হইতে—কোন জমিদার যদি ঋণ গ্রস্ত হন, তবে উপযুক্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া তাঁহাকে বাৎসরিক ৬৲ ছয় টাকা হারে স্থদ সহ ঋণ দিয়া তাঁহার অন্যান্য স্থানের ঋণ পরিশোধ করিয়া

দিতে হইবে। টাকা দেওয়ায় সময় কি ভাবে ও কতদিনে ঋণ পরিশোধ হইতে পারে তাহার একটি 'স্কীম' প্রস্তুত করিতে হইবে ও তদনুসারে বৎসর বৎসর সুদ আদায় করিয়া লইতে হইবে। নিয়ম মত সুদ দিতে না পারিলে জমিদার কমিটির হস্তে তাঁহার সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবেন। কমিটী ২৫ বৎসর কাল জমিদারী হাতে রাখিয়া জমিদারকে ফেরত দিবেন ও অবশিষ্ট দেনা যাহা কিছু থাকে তাহা ছাড়িয়া দিবেন। ২৫ বৎসরে যে সম্পত্তি হইতে ঋণ পরিশোধ না হইতে পারে, সেই সম্পত্তির মালিককে ঋণ দেওয়া সুসঙ্গত হইবে না। প্রজার পক্ষেও ঐরূপ ঋণগ্রস্ত হইলেও ঐ নিয়মে প্রজাকেও ঋণ দিতে হইবে।

জমিদারে জমিদারে বা প্রজা জমিদারে অথবা প্রজা ও জমিদারের আমলার কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইলে গ্রাম্য কমিটী, জেলা কমিটি, তৎপরে প্রাদেশিক কমিটি বিনা খরচে তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন। কমিটির মীমাংসা যে পক্ষ অগ্রাহ্য করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে অপর পক্ষ গভর্ণমেণ্টের বিচারালয়ে যে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিবেন, তাঁহার বৈধ ব্যয় কমিটি দিবেন।

প্রজাগণকে যাহাতে মহাজনগণের নিকটে না যাইতে হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে মাসিক শতকরা এক টাকা সুদে চাষ আবাদের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য টাকা কর্জ্জ দিতে হইবে ও ফসল উৎপন্ন হইলে উহা আদায় করিয়া লইতে হইবে। ফসল উৎপন্ন

হইলে যদি খরিদ্দারের অভাব ঘটে, তবে কমিটি হইতে ঐ সকল ফসল ক্রয় করিয়া রাখিতে হইবে এবং সেই ফসল পর পর পাঁচ বৎসর যে দরে বিক্রয় হইয়াছে তাহার একটা গড় ধরিয়া মূল্য অবধারণ করিয়া লইতে হইবে। ঐ সকল ফসল ক্রয় করার জন্য যাহা লাভ হইবে তাহা সাধারণ ফণ্ডভুক্ত করা হইবে ও যাহা লোকসান হইবে তাহা সাধারণ ফণ্ড হইতে দেওয়া হইবে।

এইরূপ ভাবে কার্য্য হইলে বাঙ্গলা দেশ ভূ-স্বর্গে পরিণত হইবে ইহাই আমার বিশ্বাস, এবং ইহার ফলেই স্বরাজ আপনিই আসিয়া পড়িবে। সাধারণে মনে করিতে পারেন এইরূপ মিলন অসম্ভব, কিন্তু আমার বিশ্বাস মহাত্মার অহিংসা অসহযোগ যদি সম্ভব-পর হয় তবে এই মিলনই বা কেন সম্ভবপর হইবে না। ইহা অহিংসা অসহযোগের অপেক্ষা অনেক সহজ, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন।

চাষের কথা

"সেবাশ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।"

এই শাস্ত্র বচন আমরা মোটেই গ্রাহ্য করি না। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে আমাদের দেশে শ্ববৃত্তির প্রতি অসঙ্গতশ্রদ্ধা আসিয়া পড়িয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে কেহ ব্যবসা বা কৃষিকার্য্য করিলে তাহাকে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও সকলের নিকট বিদ্রূপ ভাজন হইতে হইত। আমাদের শাস্ত্রকারগণের প্রদর্শিত জীবনোপায়গুলি কি জন্য উপেক্ষিত হইয়াছে ও নিষিদ্ধ জীবনোপায় "সেবা" কেন এত আদরণীয় হইয়াছে তাহার কারণ এই যে চাকুরী করিতে মূলধনের আবশ্যক হয় না ও কার্য্যটী তত কঠিন নহে। বর্ত্তমান যুগে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করা সম্ভবপর নহে। "অমৃত" অর্থাৎ অযাচিত দান অথবা "মৃত" অর্থাৎ যাচিত ভক্ষ বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য; সুতরাং প্রমৃত অর্থাৎ কৃষি এবং বাণিজ্য এই দুইটী মাত্র বৃত্তি অবলম্বন করা যাইতে পারে, কিন্তু এই দুইটীই কঠিন কাজ। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ব্যতীত সফলকাম হইবার উপায় নাই। ইহাতে চাকুরীর ন্যায় ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সাহেবের নিকট দাঁত খিচুনী সহ্য করিয়া অপরাহ্নে বাটী ফিরিয়া স্ত্রীগণ ও অজ্ঞ কৃষকপ্রতিবেশীগণের মধ্যে

লম্বশার্ট পটাবৃত হইয়া, আমি জজের কেরাণী বলিয়া দর্প করিবার কিছুই নাই। তাই আমরা অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালী সহজসাধ্য সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। আর ভিন্ন প্রদেশীয় মাড়োয়ারী প্রভৃতি বাঙ্গলার বাণিজ্য করতলগত করিয়া কোটীশ্বর হইয়া বসিয়াছে। আমরা ইহা দেখিয়াও দেখিতেছি না শুনিয়াও শুনিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না।

সুখের বিষয় যদিও বর্ত্তমান আন্দোলন এই সেবাবৃত্তির উপর ঘৃণা উৎপাদন করিয়াছে কিন্তু তথাপি আমাদের মোহ কাটিতে অনেক বিলম্ব আছে। বর্ত্তমানে যদি স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা না করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে কাল যাপন করি তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে, এবং দারিদ্রের অন্তস্তলে চিরতরে ডুবিয়া যাইতে হইবে সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি উপস্থিত চতুর্থ বৃত্তি কৃষি সম্বন্ধে কিছু বলিব। ভদ্রঘরের ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষিকার্য্য করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখা যায়, এবং তাঁহাদের মধ্যে যাহারা স্বল্পবিত্ত তাঁহারা প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন এরূপও দেখা যায়, এ জন্য সাধারণের বিশ্বাস যে ভদ্র লোকের মধ্যে চাষে কিছু হয় না। এই ধারণা আমি সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া মনে করি। ভদ্রলোকের কৃষিকার্য্য করার কতকগুলি সুবিধাও আছে। কৃষকগণের মধ্যে নিজের মূলধন প্রায় অনেকেরই নাই। যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহারা মহাজনের নিকট পূর্ব্বেই খাইয়া বসিয়া থাকে কাজেই ফসল পরিপক্ব হইলেই মহাজনগণ যাতায়াত আরম্ভ

করে ও ফসল গৃহজাত হইতে না হইতেই মহাজনে মাপিয়া লইয়া যায়। মাপ করিয়া লইবার সময় প্রায়ই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে মাপে অধিক লইয়া যায় এবং মূল্য দিবারসময়ে ও বাজার দর অপেক্ষা অল্প মূল্য দিয়া থাকে তাহার উপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ত আছেই, ফলে কৃষকের ক্ষেত্রে যত ভাল ফসলই হউক না কেন তাহার ঋণ থাকিয়াই যায়। কৃষক অভাবগ্রস্ত বিধায় ক্ষেত্রে রীতিমত আবাদ সকল সময়ে করিয়া উঠিতে পারে না, নিজের শরীরের দ্বারা যাহা হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। মূল্যবান ফসল প্রস্তুত করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন কৃষককুলের তাহা প্রায়ই সংগ্রহ হয় না। পক্ষান্তরে কোন ভদ্রলোক কৃষিকার্য্য করিলে কৃষকের ন্যায় মূলধনের অভাব হয় না এবং মহাজনগণ ফাঁকি দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে না এবং মূল্যবান ফসল উৎপন্ন করিয়া প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইতে পারেন। ভদ্রলোকের অকৃতকার্য্য হইবার প্রথম কারণ কৃষি-বিষয়ে অজ্ঞতা দ্বিতীয় কারণ যথেষ্ট মূলধন না লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া, তৃতীয় কারণ শ্রমবিমুখতা ও চতুর্থ কারণ আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করে এরূপ কার্য্যদক্ষ কৃষাণের অভাব। এই কয়টি বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই লাভবান হওয়া যাইতে পারে।

ভদ্রলোকের মধ্যে চাষ করিয়া সাধারণতঃ যাহা ঘটে তাহা এই যে একজোড়া দুর্ব্বল বলদ লইয়া একখানি লাঙ্গল করা হইল, কিন্তু জমি করা হইল ২০/ কি ২৫/ বিঘা, তাহাতে এই ফল হয়

যে সকল জমি ভালরূপে কর্ষণ করা ঘটিয়া উঠে না অথচ তাড়াতাড়ি করিয়া সকল জমিই বুনন করা চাই। জমি ভালরূপ কর্ষিত না হইলে জমির উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি হয় না এবং আগাছা অধিক পরিমাণে জন্মে, কাজেই তৃণাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে অধিক ব্যয় পড়িয়া যায়, ফলে লাভ না হইয়া লোকসান হইয়া পড়ে। চাষে লাভবান হইতে হইলে কয়খানি লাঙ্গল ন্যূনকল্পে আবশ্যক তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে জানা যাইবে—

"নিত্যং দশহলে লক্ষ্মীর্নিত্যং পঞ্চহলে ধনম্।
নিত্যঞ্চ ত্রিহলে ভক্তং নিত্যমেকহলে ঋণম্॥
আত্মপোষণ-মাত্রস্তু দ্বিহলেন চ সর্ব্বদা।
পিতৃদেবাতিথিনাঞ্চ পুষ্ট্যর্থং সোঽক্ষমোভবেৎ॥"

অর্থাৎ যাহার দশখানি লাঙ্গলের চাষ আছে,তাঁহার ঘরে লক্ষ্মী বিরাজিত। যাঁহার পাঁচখানি লাঙ্গলের চাষ আছে তাঁহার ধন আছে বুঝিতে হইবে। যাঁহার তিনখানি লাঙ্গল তাঁহার অন্নের অভাব নাই। যাহার দুইখানি মাত্র লাঙ্গল তাঁহার কোনরূপে নিজের ভরণপোষণ চলে মাত্র, পিতৃ ও দেবকার্য্য এবং অতিথি সেবা করিবার সাধ্য হয় না। যাহার একখানি মাত্র লাঙ্গল তাঁহার লাভ ত হয়ই না বরং নিত্য ঋণ হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে একখানি মাত্র লাঙ্গল করিয়া কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ঋণগ্রস্ত হইয়া শেষে বিপন্ন হইতে হয়। একখানি লাঙ্গল করিয়া ক্ষুদ্রাকারে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। একখানি লাঙ্গল অর্থে দুইটী উৎকৃষ্ট বলদ দ্বারা চালিত লাঙ্গল। নিকৃষ্ট

বলদ দ্বারা চালিত লাঙ্গলকে একখানি লাঙ্গল বলা যাইতে পারে না।

যে কার্য্যই যিনি করুন না কেন প্রথমে ভালরূপ শিক্ষালাভ করিয়া তবে স্বাধীনভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কৃষি সম্বন্ধেও তাহা প্রয়োজ্য। কৃষিকার্য্য চাষার কাজ বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার জিনিষ নহে; পরন্তু রীতিমত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে পদস্খলন অনিবার্য্য। কৃষি-কার্য্য করিতে হইলে বাবু হইলে চলিবে না, কৃষকের ন্যায় স্বহস্তে আবাদের কার্য্য করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইবে নতুবা এইরূপ ভদ্র কৃষকের ক্ষেত্রে কেহই আন্তরিক পরিশ্রম করিবে না কাজেই লোকসানের সম্ভাবনা।

নিম্নে কয়েকটি ফসলের আবাদের বিষয় প্রদর্শিত হইল ঐ গুলির মধ্যে একটি মাত্র আবাদ করিলেও মাসিক ১৫।২০ টাকা আয় হইতে পারিবে। এতদ্বারা যদি একজন যুবকও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে সক্ষম হন তবে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আলুর আত্মকাহিনী

হে যুবকগণ! আমি ক্ষুদ্র হইলেও তোমাদের ভারতমাতার সন্তান, তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। সেজন্য তোমাদিগকে আমার কথা কিছু শুনাইতে চাই। আমার জীবনী হইতে যদি তোমরা কিছু উপকার পাও, ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা। অবশ্য আমার কথায় তোমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইবে কি-না ভবিতব্যতাই জানেন। তোমাদের কাণে কোন কথা প্রবেশ করিলে অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেই দেখি, সেজন্য আশা খুবই কম। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতেই তোমরা অনেক দেখিলে ও অনেক শিখিলে। তাহার কোনটা তোমাদের মনে আছে? তোমরা যদিও কোন কথা শোন কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, ঘরে ঘরে ঝগড়া বাধাইয়া কার্য্য পণ্ড করিয়া ফেল। তোমরা নিজের ঘরে চোরের মত থাক। বিদেশীরা যতক্ষণে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি তোমাদের যোগাইবে, ততক্ষণে তোমরা পাইবে। মহাত্মার উপদেশে দিন কতক

ধরিয়া বস্ত্রের অভাব ঘুচিবার উপায় হইতেছিল কিন্তু কাহার পরামর্শে তোমরা তাহা ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দিতেছ? তোমরা চাকুরীই সার করিয়াছ। যাহারা শ্ব-বৃত্তি এত ভালবাসে তাহারা স্বরাজ পাইবে কিসে? আমি নীচ বলিয়া আমার উচ্চ ভাষা তোমাদের ভাল লাগিতেছে না তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু তোমরা সুবুদ্ধির মত হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পার, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে আমার কথা আমি যখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন না শুনাইয়া ছাড়িব না। আমি তোমাদিগকে চাকুরী হইতে ছাড়াইবই ছাড়াইব। যদি আমি একাকী না পারি, তবে আমার আর আর ভ্রাতাদের যোগে তোমাদের চাকুরী হইতে বহিষ্কৃত করিব।

আমার জন্মস্থান অনন্ত রত্নের প্রভব হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে—নাইনিতালের নিকট। অতএব আমাকে পূর্ব্বে যেরূপ নীচ মনে করিয়াছিলে আমি তত নীচ নই। বঙ্গভূমির তুলনায় আমি পরম কুলীন। তবে যে নিজেকে নীচ বলিয়া পরিচয় দিতেছি তাহা কেবল তোমাদের বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। যাহার যোগ্যতা আছে সে কি নীচ হইতে পারে?

একদিন হঠাৎ আমার সত্ত্বা আমি প্রথম অনুভব করিলাম। বোধ হইল আমি আমার পিতার পাদমূলে সর্ষপ আকারে বর্ত্তমান রহিয়াছি। ক্রমে শুক্লপক্ষের সুধাকরের ন্যায় আমি মাতৃগর্ভে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ভ্রাতাগণ আকারে আমার অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছে দেখিয়া আমার

বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু আমার বৃদ্ধি হওয়া ত আমার হাতে নয়। আমি যখন একটি কুক্কুট অণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছি, তখন হঠাৎ একদিন একজন কৃষক আমার জননীর গর্ভ বিদারণ করিয়া আমাকে বহির্গত করিল। সেই দিন আমি প্রথম সূর্য্যালোক দেখিয়া কি আনন্দ উপভোগ করিলাম তাহা আর তোমাদের কি জানাইব? উক্ত কৃষক আমাকে ও আমার ভ্রাতাগণকে ঝুড়িতে করিয়া গৃহে লইয়া গিয়া একটা পর্ণকুটীরের এক কোণে গাদা করিয়া রাখিল। ভাগ্যক্রমে আমি গাদার উপরে ছিলাম। কাজেই সেই ঘরের সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিলাম। তাহাদের জীর্ণ কুটীরে দেখিবার মত বড় কিছুই ছিল না; তথাপি সেই কৃষক-দম্পতী ও তৎপুত্র কন্যাগণের নীরোগ দেহ ও আনন্দ কোলাহলে আমি পরম সুখেই কাল যাপন করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই সুখ আমার অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না। একজন মহাজন ঐ কৃষককে কয়েকটি সাদা সাদা গোল গোল কি দিয়া আমাদের সকলকেই একটি বস্তায় বন্দী করিয়া ফেলিল। তখন আমার মনে যে কষ্ট হইতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। তখন আমি ভাবিলাম আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে বিচার আচার কিছুই নাই, বিনা অপরাধে আমাকে বন্দী করিয়া লইল এবং আমার রক্ষাকর্ত্তা কৃষক কয়টা সাদা চাকতি পাইয়া এরূপ অবিচারের কোনও প্রতিকার করিল না। বস্তায় বন্দী করিবার পরও উহারা উপর্য্যুপরি কয়েকবার আছাড় মারিয়া আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। পরে যখন

সংজ্ঞা লাভ করিলাম, তখন বোধ হইল কোথায় চলিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে 'ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ শুনিতে পাইলাম। খানিক পরে আবার কয়েকবার আঘাত পাইয়া অজ্ঞান হইলাম পুনরায় জ্ঞান লাভ হইলে ভাল করিয়া শুনিলাম ভোঁস্ ভোঁস্ শব্দ হইতেছে, আর আমিও নক্ষত্র বেগে চলিতেছি। কয়েকদিন এইরূপেই কাটিল। তাহার পর আবার একদিন বেদম আছাড় খাইলাম। এই আছাড় খাইয়া আমার জ্ঞান হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। হঠাৎ জ্ঞান লাভ করিয়া দেখি আমি বাংলা দেশে শেওড়াফুলি নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে পুনরায় সূর্য্যালোক আমার দৃষ্টিপথে পড়িল। এখানে বহুজনাকীর্ণ হাটের মধ্যে আমি নীত হইলাম। নানা লোকে আসিয়া আমাদিগকে ভক্ষণ করিবাব কথাই বলিতে লাগিল। আমি ঐ সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলাম। জন্মিবার পূর্ব্বেই মৃত্যু ; কে আকাঙ্ক্ষা করে ? কিন্তু আমি নিরাশ্রয়। তাহাদের দয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। আমার মনে হইতে লাগিল মনুষ্য জাতি কি নিষ্ঠুর ! তাহারা আবার লঙ্কাবাসীদের রাক্ষস বলিয়া ঘৃণা করে। ইহারা রাক্ষসদের অপেক্ষা কিসে কম ? একদিন একটি যুবক আসিয়া আমাদের মধ্যে বীজ জাতীয়গুলি চাহিল। তখন আমাদের গাদায় হাত পড়িল। এক্ষণে আমি বুঝিলাম দোকানদার কেন আমাদের ছোটগুলি বাছিয়া স্বতন্ত্র গাদা দিয়া রাখিয়াছে এবং বুঝিলাম পরম কৃপাময় আমাকে ক্ষুদ্র আকার করিয়া, আমার প্রতি কতখানি কৃপা ঢালিয়া দিয়াছেন। আমার মন আনন্দে নৃত্য

করিতে লাগিল এবং ছোট হইয়াছি বলিয়া যে কষ্ট অনুভব করিতেছিলাম তাহাও দূরীভূত হইয়া গেল। তখন আমাকে বস্তায় পুরিয়া একজন মানুষের ঘাড়ের উপর চাপাইয়া দিল।

নানা স্থানে ঘুরিয়া নৌকাযোগে শেষে সেই যুবকের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। ঐ যুবককে সমাগত দেখিয়া তাহার পিতা মাতা উভয়েই সমাদর করিয়া ঘরে লইলেন, বস্তাবদ্ধ অবস্থায় আমাদের দেখিয়া পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বস্তায় কি রে ?' পুত্র বলিল—'আলুর বীজ'। পিতা—'কি হইবে ?'

পুত্র—'আমাদের পুষ্করিণীর ধারে যে জমিটা আবাদ করিয়া রাখিয়াছি, ঐ জমিতে বসাইব'।

পিতা—'এ দেশে কি আলু হয়। অনর্থক কতকগুলি পয়সা নষ্ট হইবে।'

পুত্র—'এক বিঘা জমি বৈ ত' নয়। কতই আর খরচ হইবে ? পরীক্ষাই দেখা যাক্ না কেন ? আমি যদি কৃতকার্য্য হই, তবে এদেশে সকলেই আমার অনুসরণ করিবে।'

পিতা আর কোন প্রতিবাদ করিলেন না। তাঁহাদের কথা-বার্ত্তায় আমি বুঝিলাম—পুত্র কৃতবিদ্য বি, এ, না কি পরীক্ষায় যশের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া নিজ গ্রামে বসিয়া কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবন-যাপন করিবেন বলিয়া কৃত-সংকল্প, এবং তাঁহার যোগ্য পিতাও পুত্রের স্ব-বৃত্তি দেখিতে অনিচ্ছুক এবং পুত্রকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া থাকেন। এই সকল জানিয়া আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

পরদিবস প্রাতে আমাকে একটা ঝাঁকায় উঠাইয়া লইয়া একটি পুষ্করিণীর পাড়ে লইয়া গেল। তথায় ঐ যুবককেও দেখিলাম। যুবক কোদাল হস্তে করিয়া কর্ষিত ভূমিতে কয়েকজন মজুরের সহিত জমির এক প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানিল ও ঐ রেখার উপর রেড়ির খইলের গুড়া ছিটাইয়া দিয়া, কোদাল দ্বারা রেখাটিকে বরাবর কোপাইয়া গেল। পরে আমাদের এক একটিকে ধরিয়া আধহাত অন্তর পুঁতিয়া যাইতে লাগিল। আমাদের মধ্যে যেগুলি আকারে বড় ছিল, সেগুলিকে খণ্ড করিয়া কাটিয়া বসাইয়া দিতে লাগিল। ঐ মূল দাঁড়াটিতে বীজ বসান শেষ হইলে ঐ দাঁড়ার গায়ে সমকোণ করিয়া দেড় হাত অন্তর পাঁচ হাত লম্বা বহুসংখ্যক লাইন অঙ্কিত করিয়া, ঐ গুলিও কোদাল দ্বারা কোপাইয়া, তাহাতে বীজ বসাইয়া দিল। একটি পোড় * শেষ হইয়া গেল বলিয়া যুবক তাহার সঙ্গীগণকে তামাকু সেবনের অবকাশ দিল। পরে মূল দাঁড়ার সহিত সমান্তরাল করিয়া একটি নূতন পেড়ে সৃষ্টি করিল। এই নূতন পেড়েতেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বীজ বসাইয়া দিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদয় জমিতেই বীজ বসাইয়া ফেলিল। আমিও ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেলাম প্রোথিত হইবার পূর্ব্বে আমার বড়ই আতঙ্ক হইয়াছিল। আমি মৃত্তিকা মধ্যে যাইয়া আমার বড়ই আরাম বোধ হইতে লাগিল। কয়েকদিন পরে

---

* মূল দাঁড়া ও তাহার সহিত সমকোণে ৫ হাত সারি গুলির একত্রে নাম পেড়ে।

মৃত্তিকার রসাভাব-প্রযুক্ত, আমরা তৃষ্ণায় বড়ই কষ্ট পাইতে-ছিলাম। শীঘ্রই একদিন প্রাতঃকালে উপরে জল ছিটানর শব্দ পাইলাম; সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম।

দুই একদিন পরেই আমার গাত্র হইতে অঙ্কুর বহির্গত হইতে লাগিল। ক্রমে ঐ অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইলে, মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়া পড়িলাম। উপরের অনুপম সৌন্দর্য্য আবার আমার নয়ন গোচর হইল। আমি দেখিলাম আমার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, আমি নবজীবন লাভ করিয়াছি। এই সময়ে একদিন ঐ যুবক তাহার একজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল এবং আলুর আবাদ সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। উক্ত বন্ধুটি আসিয়া বলিল—"বাঃ ইহার মধ্যেই যে সকলগুলি বাহির হইয়াছে দেখিতেছি।" যুবক উত্তর দিল—'হাঁ, ইহার পূর্ব্বেই চারাগুলি বাহির হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জমি আবাদ করার পর বীজ আনিতে বিলম্ব হওয়ায়, জমি শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় রসাভাব জন্য চারা বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছিল। সেদিন ঐ জলদাঁড়াগুলির দ্বারা জল আনাইয়া ছোট ছোট থালার দ্বারা জল ছিটাইয়া দেওয়ায় সমস্ত চারাগুলি বাহির হইয়াছে।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল—'ভাই এই জমি কি ভাবে আবাদ করিয়াছ।' যুবক উত্তর করিল—"প্রথম বৈশাখ মাস হইতে জমিতে চাষ দিয়া আসিতেছি শেষ পর্য্যন্ত বার বার চাষ দিয়া

মাটী ধূলার মত করিয়াছি; পরে আশ্বিন মাসে কুড়িগাড়ী গোময় সার ছিটাইয়া দিয়া বীজ বসাইবার সময় ৪৴০ মণ গুড়া খইল দিয়াছি।”

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল—‘কিসের খইল দিয়াছ?’

যুবক উত্তর দিল—‘রেড়ীর খইল দিয়াছি। রেড়ীর খইল অন্য খইল অপেক্ষা অধিক তেজস্কর। সরিষার খইলও মন্দ নহে। ক্রমাগত জমিতে রেড়ীর খইল না দিয়া, কোন কোন বৎসর সরিষার খইল দিলে, একই জমিতে বৎসর বৎসর আলু করা চলে। ক্রমাগত রেড়ির খইল দ্বারা, একই জমিতে আলুর আবাদ করিলে আলুর রোগ জন্মে। আলু উঠাইয়া লইয়া আলুর জমিতে পাট দিলে উৎকৃষ্ট পাট জন্মে এবং পাট কাটিয়া লইয়া সেই জমিতে আলু দিলে, আলুও ভাল হয়। আমি মাটী ধরাইবার সময় আরও ৪৴০ মণ গুড়া খইল গাছের গোড়ায় দিয়া মাটি চাপা দিয়া দিব।

বন্ধু—কতগুলি বীজ লাগিল?

যুবক—বীজগুলি ছোট ছিল বলিয়া ৩৴০ মণ লাগিয়াছে। বীজ বড় হইলে আরও অধিক লাগিত। এমন কি ৫৴০ কি ৬৴০ মণ পর্য্যন্ত লাগিতে পারে। ক্ষুদ্র জাতীয় বীজ ১৴০ এক মণেও এক বিঘা জমি বসান চলে। বড় বীজ কাটিয়া বসান চলে, সে জন্য কম লাগে। আলুর গায়ে ‘চোক’ অর্থাৎ অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য ছোট ছোট গর্ত্ত আছে, সেগুলি রক্ষা করিয়া কাটিতে হয়। যে খণ্ডে উহা থাকে না, সে খণ্ডে কোনও কাজ হয় না।

পরদিন প্রাতে ঐ যুবক কতকগুলি মজুর সঙ্গে করিয়া আসিল ও আমাদের প্রত্যেকের গোড়ায় এক মুঠা করিয়া গুঁড়া খইল দিয়া, প্রত্যেক দাঁড়ার মাটী, দুই পার্শ্বে ঈষৎ উচ্চ করিয়া দিল এবং গাছের গোড়া একরূপ ফাঁকই থাকিল। এইরূপে দাঁড় করাইয়া দেওয়ার সময় দুই দাঁড়ার মধ্যস্থিত স্থান পূর্ব্বোক্ত জল দাঁড়ার ন্যায় ঈষৎ খাল হইয়া গেল। পরদিবস তাহারা জল সেচন আরম্ভ করিল। ক্রমে জল আসিয়া দুই দাঁড়ার মধ্যস্থিত খালগুলি ভরিয়া গেল। আমি তৃপ্তির সহিত ঐ জল পান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম ও আমার শরীর ক্রমে সবল হইতে লাগিল। পরে আর একদিন দেখিলাম, কোদাল হস্তে আসিয়া আমাদের গোড়ায় বেশ করিয়া মাটী ধরাইয়া দিয়া গেল। আমাদের মধ্যে অনেকেরই গোড়ায় মাটী না থাকায় হেলিয়া পড়িয়াছিল! ঐ মাটি ধরাইয়া দেওয়াই তাহাদেব সহিত আমিও পুনরায় সোজা হইয়া দাঁড়াইলাম।

দাঁড়ার মাটীগুলি শুষ্ক হইলে যখনই আমাদের প্রবল পিপাসা বোধ হইত, তখনই তাহারা আসিয়া জল সেচনে আমাদের পিপাসা শান্ত করিত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমি ফুলে ফলে সুশোভিত হইলাম। প্রায় তিন মাস অতীত হইয়া গেলে; ক্রমে নিজেকে বলহীন বোধ করিতে লাগিলাম। বার্দ্ধক্যের করাল ছায়া আমাদের মুখের উপর পতিত হইল এবং আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীর্ণ হইয়া হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিল। যখন আমার শরীর শুষ্ক হইয়া প্রায় আয়ুক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহারা কোদাল

হস্তে পুনরায় আসিল। এবার তাহাদের সহিত কতকগুলি ঝাঁকা দেখিলাম। তাহারা আসিয়াই আমার পাদমূলস্থিত সন্তান-সন্ততিগণকে উঠাইয়া ঝাঁকা বোঝাই করিতে লাগিল। শেষে আমার সন্তান সন্ততিগুলিকে অপহরণ করিল। আমার তখন নাভিশ্বাস উপস্থিত। এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আমাদের সন্তান-সন্ততিগুলিকে ওজন করিল। দেখিয়া বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করিল—'ভাই কয় মণ হইল ?'

যুবক উত্তর করিল—'৮০/০ মণ হইয়াছে।'

বন্ধুটি পুনরায় প্রশ্ন করিল—'বীজ আনিতে ত' তোমার এ বৎসর অনেক টাকা পড়িয়া গিয়াছে। আগামী বর্ষেও কি পুনরায় বীজ আনিতে হইবে ?"

যুবক বলিল—'না, আগামী বর্ষে এই আলু হইতেই বীজ রাখা হইবে। এই আলুগুলির মধ্যে যেগুলি কুক্কুট-অণ্ডের আকার, সেইগুলি বাছিয়া ৬/০ ছয় মণ পরিমাণ বীজের জন্য রাখিয়া দিব এবং ৪/০ মণ সংসার খরচের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট বিক্রয় করিয়া দিব মনস্থ করিয়াছি। এই স্থানীয় বীজে ৩ বৎসর চলিবে। তৃতীয় বর্ষে অল্প পরিমাণ নূতন বীজ লইয়া আসিব এবং উক্ত বীজ হইতে যে আলু হইবে, তাহা হইতে বীজ সংগ্রহ করিলে আরও তিন বৎসর চলিবে। এইরূপে তিন বৎসর অন্তর নূতন বীজ সংগ্রহ করিতে হয়।"

বন্ধুটি বলিলেন—"ভাই, আমিও আগামী বর্ষে এক বিঘা

আলু বসাইব।" ঐ স্থানের একজন মহাজন কলিকাতা হইতে আলু আনাইয়া বিক্রয় করে, সে নাকি প্রতিমণ ৫৲ টাকা হিসাবে লইবার জন্য বায়না করিয়াছে। তাহাতে বুঝিলাম আমার সন্তান-সন্ততিগণের বিনিময়ে যুবক ৪০০৲ টাকা পাইবেন। এই চাষে যুবকের ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ৭৫৲ টাকা। ঐ ৭৫৲ টাকা ও ১০৴০ মণ আলু যাহা তিনি নিজে রাখিবেন, তাহার মূল্য ৫০৲ টাকা একুনে ১২৫৲ বাদ দিলেও ২৭৫৲ টাকা যুবক লাভ করিলেন বুঝিলাম।

হে বঙ্গীয় যুবকগণ আসন্নকালে তোমাদিগকে আমার পালক ও পোষক যুবকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতেছি! আমার জাতি কল্প-বৃক্ষ সদৃশ। আমাদের সেবা করিলে তোমরা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ রূপ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে পারিবে। আমাদের সেবা করিলে, তোমাদের আর শ্ব-বৃত্তি করিয়া জীবন-যাপন করিতে হইবে না। এইরূপে স্বাবলম্বী হইয়া তোমরা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জ্জন কর! আমাদের জাতির যোগ্যতা কত বেশী তাহা কি তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? আমাদের আদি পুরুষের জন্মভূমি সুদূর আমেরিকা খণ্ডে। গুণ-গ্রাহী মহাত্মা সার ওয়াল্টার র‍্যালে আমাদের আদর করিয়া লইয়া আসিয়া, ইউরোপখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করান। পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুকম্পায় আমরা এই স্বর্ণপ্রসূত ভারত ভূমিতে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছি। এক্ষণে সুদূর পল্লীতেও আমরা একাধিপত্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহার

মুলে কি—তাহা তোমরা জান কি ? যোগ্যতা ব্যতীত কেহই জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। তোমরাও তাহা পারিবে না।

আমার উপদেশ শুন। প্রথমে স্বাবলম্বী হইয়া যোগ্যতা অর্জ্জন কর। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে তোমরা জান না? যদি কেহ তোমাদের মধ্যে নেতার যোগ্য থাকেন, তবে তিনিই আছেন। তিনি কর্ম্মবীর, কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য কর। আমার কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত, আর আমার বলিবার শক্তি নাই। এক্ষণে জন্মের মত বিদায়।

আকের চাষ

বাঙ্গালী জাতি চাকুরির মোহে এতই অভিভূত যে ১০৲ টাকা কি ২৫৲ টাকার চাকুরী পাইলে অনেকেই নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু একটু কষ্ট করিলে ২০৲ কি ২৫৲ টাকার শ্ব-বৃত্তি করার কোনই আবশ্যক হয় না। নিজের কাজের জন্য শারীরিক পরিশ্রম কখনই নিন্দনীয় হইতে পারে না।

পল্লীবাসী প্রায় সকল মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরই কিছু না কিছু জমি আছে। যদি নিজের জমি নাও থাকে, তবে একবিঘা জমি সংগ্রহ করা অসম্ভব বা ব্যয়সাধ্য নহে। মোট কথা জলাশয়ের নিকট একবিঘা জমি সংগ্রহ করিয়া ঐ জমিতে যদি ইক্ষুর চাষ করা যায় তবে একজনের ১০৲ কি ২০৲ টাকা মাসিক আয় অনায়াসেই হইতে পারে। অবশ্য ইহাতে যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায় আবশ্যক নতুবা কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।

ইক্ষুর চাষ দুই প্রকারে করা যায়। প্রথম প্রকার এই যে মাঘ বা ফাল্গুন মাসে ইক্ষুর বীজ বা ডগা জমিতে বসাইতে হয়। দ্বিতীয় প্রকার, বৈশাখে বারিপাত হইলে ইক্ষুর বীজ জমিতে বসাইতে হয়। প্রথম প্রকারে আবাদের ব্যয় কিছু অধিক পড়ে

এবং দ্বিতীয় প্রকারে আবাদের ব্যয় কিছু কম পড়ে ও হাঙ্গামাও অনেক কম। কিন্তু প্রথম প্রকারে প্রথমবর্ষে উৎপন্ন ফসলের মূল্যও অনেক অধিক হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে ফসলের মূল্যের কোনও পার্থক্য নাই।

প্রথম প্রকার আবাদে একবিঘা জমিতে ইক্ষুর আবাদ করিতে যাহা ব্যয় পড়ে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১।	ইক্ষুর বীজ বা ডগা ፥৴০ বিঘা জমির উপযুক্ত মূল্য	২০৲
২।	উক্ত জমিতে ১০ টা চাষ দিতে খরচ	১০৲
৩।	গোবর সার দশ গাড়ীর মূল্য গাড়ী ভাড়া সহ	৭৷৷০
৪।	ডগা কাটিয়া হাপর দেওয়ার মুনিষ (জন) ৪টা	২৲
৫।	জমিতে ডগা বসাইবার মুনিষ ৮টা	৪৲
৬।	ঐ ডগা বসাইবার পূর্ব্বে জমি ভিজাইয়া লওয়ার জন্য জল সেচনের মুনিষ ৮টা মায় খোরাকি	৬৲
৭।	ঐ ডগা বসানর পরে জল সেচনের মুনিষ ৮টা	৬৲
৮।	ঐ জমিতে দ্বিতীয় সেচের পর চাঁচ দেওয়া মুনিষ ৬টা	৩৲
৯।	বৃষ্টি হইলে চাপান বা আকের গোড়ার মাটী ধরাইয়া দিবার জন্য মুনিষ ৬টা	৩৲
১০।	চাপান দিবার সময় যে খইল দিতে হয়, তাহার মূল্য ৬৴০ ৩৲ হিসাবে	১৮৲

১১।	কার্ত্তিক মাসে জল সেচনের মুনিষ ৩টা (এই সেচ জলাভাব হইলে আবশ্যক)	৩৷৷০
১২।	পাতা জড়াইয়া দেওয়ার জন্য মুনিষ ১০টা	৫৲
১৩।	ইক্ষুকে সোজা রাখিবার জন্য বাঁশ খরিদ ৩০ খান	৪।০
১৪।	দড়ি খরিদ ঐ জন্য	১৲
১৫।	ঐ কার্য্যের জন্য মুনিষ ১৩টা	৬৷৷০
		১১০৲

এক দফায় লিখিত ইক্ষুবীজ বোম্বাই বা সামসাড়া হওয়া আবশ্যক; কারণ ঐ জাতীয় ইক্ষু অধিক মোটা ও লম্বা হইয়া থাকে। কাজেই এক গাছ ইক্ষুর মূল্যও অধিক। সেজন্য বৃহৎ জাতীয় ইক্ষুরই আবাদ করা সঙ্গত। উক্ত ডগা সংগ্রহ করিয়া একটী পুষ্করিণীর পাড়ে একটি হাপর করিতে হয়। অর্দ্ধ হস্ত গভীর করিয়া একটী গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তাহা সমতল করতঃ ঐ সমতল স্থান কোদাল দ্বারা কোপাইয়া লইয়া, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে জল দিয়া কাদা প্রস্তুত করিতে হয় এবং আকের ডগাগুলি সোজা করিয়া উহার চারি আঙ্গুল পরিমাণ অংশ কাদার নীচে বসাইয়া দিতে হয়। একটীর পর আর একটী করিয়া গায়ে গায়ে সারি দিয়া সমস্ত ডগাগুলি সাজাইয়া দিয়া কতকগুলি আকের শুষ্ক পাতা, কলার বাস্না অথবা খড় দিয়া ঐ ডগাগুলি চাপা দিয়া দিতে হয়। যাহাতে ঐ

ডগাগুলিতে রৌদ্র না লাগে, ইহাকে কাদা হাপর দেওয়া বলে। ইহার পরে প্রতি সপ্তাহে যথেষ্ট পরিমাণে জল দেওয়া ব্যতীত, আর কিছুই করিতে হয় না।

জমিতে ডগা বসাইবার ২০ কি ২৫ দিন পূর্ব্বে উহা হাপর হইতে উঠিয়া প্রত্যেকটীতে তিন বা চারিটী করিয়া গিরা রাখিয়া খণ্ড করতঃ একটা গাছের নীচে অর্থাৎ ঠাণ্ডা স্থানে কাদা-হাপরের ন্যায় একটী হাপর প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ঐ হাপরের নিম্নের সমতল ভূমি কাদা-হাপরের ন্যায় কোপাইয়া বা কাদা করিয়া লইতে হয় না। উক্ত সমতল ভূমিতে এক একটী খণ্ড করা ডগা সোজা ভাবে বসাইয়া একটী লাইন করিতে হইবে পরে গুঁড়া মাটীর দ্বারা নিম্ন অংশ ঢাকিয়া দিতে হইবে। ঐ গুঁড়া মাটী দ্বারা যাহাতে একটী গিরা ঢাকা পড়ে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একটী গিরা ঢাকিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, ইক্ষুর ডগার গিরার কাছেই শিকড় বাহির হয়, অন্যত্র বাহির হয় না। যে গিরাটী নীচে থাকিবে, তাহার কড় বাহির হইবে না, সেজন্য একটী ডগাতে একাধিক গিরা মাটী চাপা দেওয়া সুবিধাজনক নহে। গুঁড়া মাটী অতি অল্প পরিমাণে দিতে হইবে যে দ্বিতীয় লাইনে যে ডগা বসান হইবে, তাহা প্রথম লাইনের ডগার সহিত লাগিয়া থকে। এইরূপে সমস্ত খণ্ড ডগাগুলি সাজান হইলে চারিধারের মাটীর দ্বারা আইল দিয়া দিতে হয়। যাহাতে ঐ হাপরের জল দিলে জল হাপর হইতে বাহির হইয়া না যায়। ইহার পর

কোনও পুষ্করিণী বা ডোবা হইতে পচা পাঁক সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, তাহার সহিত গোময় মিশ্রিত করিয়া বেশ করিয়া গুলিয়া লইয়া, ঐ সাজান ডগাগুলির উপর এরূপ ভাবে জোরে ছিটাইয়া দিতে হয়, যাহাতে ঐ ডগাগুলি ঢাকিয়া যায়। ইহাকে ডগায় 'ছাপ' দেওয়া বলে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে ডগাগুলি পাতলা আবরণে আবৃত হইলে প্রত্যেক গিরাতেই ছোট ছোট শিকড় বাহির হইয়া থাকে, অথচ প্রত্যেক গিরায় যে চোক থাকে তাহা হইতে কড় হইবার ব্যাঘাত হয় না। ইহার পরে কাদা-হাপরের ন্যায় পাতা বা খড় চাপা দিয়া দিতে হয়। শেষে ঐ হাপরে যথেষ্ট পরিমাণে জল দিতে হয়। জল এরূপ ভাবে দিতে হইবে, যাহাতে উপরোক্ত 'ছোপ' ধুইয়া না যায়। উহার একস্থানে অধিক পরিমাণে পাতা চাপা দিয়া, ঐ পাতার উপর আস্তে আস্তে জল ঢালিয়া দিতে হয় এবং প্রত্যেক বারই ঐ একটী স্থানে জল দেওয়া উচিত। ৪।৫ দিন অন্তর জল দিলেই হইল। ইহাকে ধূলা হাপর বলে। ৮।১০ দিন পরেই ঐ সকল ডগায় কড় বাহির হইতে থাকে এবং ২০।২৫ দিন পরেই ডগা জমিতে বসাইবার উপযুক্ত হয়। ডগা জমিতে বসাইবার উপযুক্ত হইয়াছে কি না বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে—অধিকাংশ ডগাতে কড় বাহির হইয়াছে কি না।

আকের আবাদের জন্য সরস দোআঁশ জমিই প্রশস্ত। যে জমিতে বর্ষায় জল বাধে তাহাতে আকের চাষ হয় না। আকের

চাষে জল সেচনের আবশ্যক। সেজন্য জলাশয়ের নিকটে জমি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। তবে যে সকল স্থানের জমি অধিক সরস, সেই সকল স্থানের জমিতে বিনা সেচেও আক প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু ঐ সকল স্থানেও জল সেচনের ব্যবস্থা থাকিলে ফসল ভাল হয়। জমিতে ডগা বসাইবার পূর্ব্বে লাঙ্গল দ্বারা উহা চাষ দিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয় দফার লিখিত মত ১০টা চাষ দেওয়া আবশ্যক। জমি যদি আবাদি না হইয়া পতিত হয়, অর্থাৎ চাষার কথায় বাচড়া বা আচট হয়, তবে বর্ষার শেষে উহা বেশ করিয়া চাষ দিতে হইবে। এই সময়ে অন্ততঃ তিনবার চাষ দেওয়া আবশ্যক পরে অগ্রহায়ণ মাসে দুইবার চাষ দেওয়া আবশ্যক। জমিতে ডগা বসাইবার অব্যবহতি পূর্ব্বে দুইটী চাষ দিতে হয়। বাকী চাষ ইহার মধ্যে বৃষ্টি হইলে, 'জো' দেখিয়া চাষ দিতে হইবে। জো বলিলে বুঝিতে হইবে যে জমি এরূপ শুষ্ক হইয়াছে যে কাদা নাই অথচ মাটীতে রস প্রচুর আছে শেষে চাষের পূর্ব্বে ৩য় দফার লিখিত সার জমিতে ছিটাইয়া দিতে হয়।

প্রথম প্রকারের ইক্ষুর চাষে মাঘ কি ফাল্গুন মাসে যদি বৃষ্টি হয়, তবে ঐ বৃষ্টির পরই দুইটি চাষ ও মৈ (কোন কোন স্থানে মৈকে বাঁশই বলে) দিয়া জমিতে ডগা বসাইতে হইবে। দুই হাত অন্তর এক একটি সারি দিয়া ডগা বসাইতে হয় এবং প্রত্যেক সারিতে এক হাত অন্তর 'থুপী' কাটিয়া অর্থাৎ সামান্য একটু গর্ত্ত

করিয়া, ঐ গর্ত্তে এক একখানি ডগা লাইনের সহিত লম্বা-লম্বি ভাবে রাখিয়া তাহার উপর একটু জল দিয়া ঐ জলের দ্বারা যে কর্দ্দম হইবে তাহাতে ডগাগুলি টিপিয়া বসাইয়া দিতে হয়। পরে খুপী কাটিবার সময় যে মাটী তুলিয়া রাখা হইয়াছে, ঐ মাটী দ্বারা ডগাগুলি চাপা দিয়া দিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ঐ ডগাগুলি দুই অঙ্গুলি পরিমাণ মাটীর নীচে পোঁতা না হয়। যদি মাঘ বা ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি না হয়, তবে ৬ দফার লিখিত সেচ দিতে হয় ও জমিতে জো হইলে দুইটি চাষ ও মৈ দিয়া ডগা বসাইতে হয়। ডগা বসানর পর ৭ দফার জল সেচন আবশ্যক। পরে জমিতে 'জো' হইলে একটা খোঁড় দিয়া মাটি দুই লাইনের মধ্যস্থলে দাঁড়া করিয়া রাখিতে হয় এবং যে স্থানে ডগাগুলি বসান আছে—তাহার উপরের মাটী এরূপ ভাবে উঠাইয়া দিতে হইবে যাহাতে ডগার উপরের অংশ দেখা যায়। এরূপ করার উদ্দেশ্য এই যে ঐ সকল ডগার যে সকল চোখগুলি হইতে ফড় বাহির হয় নাই, তাহা হইতে এক্ষণে ফড় বাহির হইতে থাকে; এইজন্য এই খোঁড়কে চিয়েন খোঁড় বলে। চিয়েন-খোঁড় দেওয়ার পর যদি ৮।১০ দিনমধ্যে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা না থাকে তবে আর একটা সেচ দেওয়া উচিত। বৃষ্টি হইলে ১০ দফার লিখিত খইল দিতে হয়। সরিষা বা রেড়ীর খইলই দেওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক ঝাড়ের গোড়ায় দুই মুঠা করিয়া গুঁড়া খইল দিয়া, দাঁড়ার ন্যায় মাটী দুই পার্শ্ব হইতে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করিয়া কাটিয়া লইয়া, ইক্ষুর ঝাড়ের গোড়ায় দাঁড়ার ন্যায় করিয়া চাপা দিয়া দিতে হয়।

ইহাকে সারমাটি দেওয়া বলে। পরে ইক্ষুর গাছ যত বড় হইতে থাকিবে, ততই পাতাগুলি আকের গায়ে জড়াইয়া দিতে হইবে। (১২ দফা দ্রষ্টব্য) কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হইলে ১১ দফার লিখিত সেচ দেওয়া আবশ্যক।

যদি ইক্ষু খুব বড় হইয়া উঠে ও পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে উহা চারি হাত পরিমাণ উচ্চ হইলে, জমির চারি পার্শ্বে, চারি হাত লম্বা বাঁশের খুঁটা চারি হাত অন্তর পুঁতিয়া, ঐ খুটার মাথায় একটা শক্ত বাঁশের চটা আড়ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। এরূপ করিলে যদি আকগুলি পড়িয়া যায়, তবে ঐ চটায় আটকাইয়া যাইবে। অবশ্য এরূপ করিতে হইলে, ইক্ষুর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে অর্থাৎ যদি ইক্ষু খুব লম্বা না হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে অনর্থক ব্যয় করার আবশ্যক নাই। (১৩, ১৪ ও ১৫ দফা দ্রষ্টব্য)

ইক্ষু পরীক্ষা করিয়া সুমিষ্ট হইয়াছে বুঝিলে, কাটিয়া বিক্রয় করিতে পারা যায়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাস হইতে ইক্ষু সুমিষ্ট হইতে থাকে। উহা হইতে গুড় প্রস্তুত করিতে হইলে মাঘের শেষ বা ফাল্গুনের প্রথম ইক্ষু পিষিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে হয়। এক বিঘা জমিতে ভালরূপ ইক্ষু হইলে ৪০/০ মণ হইতে ৫০/০ মণ পর্য্যন্ত গুড় উৎপন্ন হইতে পারে। প্রতি মণ ৮৲ হিসাবে মূল্য ধরিলে উৎপন্ন ফসলের মূল্য ৩০০৲ টাকা হইতে ৪০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। উহা হইতে ১০০৲ টাকা খরচ বাদ দিলে ২০০৲ বা ৩০০৲ টাকা লাভ হইতে পারে। এই আয় একজন

১৫৲ বা ২০৲ টাকা বেতনের চাকুরের পক্ষে যথেষ্ট নয় কি? কিন্তু যাহারা কেবলমাত্র এক বিঘা ইক্ষুর চাষ ব্যতীত আর কিছুই করিবেন না, তাঁহাদিগকে আমি গুড় প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিই না, কারণ গুড় প্রস্তুত করিতে অনেক লোকের আবশ্যক হয়। ইক্ষু পিষিয়া লইবার জন্য বলদের এবং গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য কাষ্ঠের আবশ্যক হয়, তাহাতে আরও ২০৲, ২৫৲ টাকা অধিক ব্যয় হয়। যে সকল স্থানে ইক্ষুর আবাদের প্রথা আছে, সেই স্থানে গুড় করা সহজ। কারণ সেই স্থানে পরস্পর ঐ কার্য্যে সাহায্য করে, সেজন্য অল্পব্যয়ে গুড় প্রস্তুত হয়। ইক্ষু কাটিয়া হাটে হাটে বিক্রয় করিলে, অনেক অধিক লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

দুই হাত অন্তর সারি থাকায় প্রতি বিঘায় ৪০টী সারি থাকে। প্রতি সারিতে এক হাত অন্তর ঝাড় থাকায় প্রতি লাইনে ৮০টা করিয়া ইক্ষুর ঝাড় থাকে। অতএব এক বিঘায় ৪০ × ৮০ = ৩২০০ ঝাড় ইক্ষু জন্মে। প্রত্যেক ঝাড়ে চারি গাছ করিয়া, ইক্ষু ধরিলে প্রতি বিঘায় ১২৮০০ গাছ ইক্ষু উৎপন্ন হইতে পারে। মোটামুটী ১২০০০ ধরিলেও প্রতিগাছ ৫১০ হিসাবে উৎপন্ন ফসলের মূল্য ৬০০০ আনা অর্থাৎ ৩৭৫৲ টাকা হয়। কিন্তু ঐরূপ বড় আক বাজারে অধিক মূল্যেই বিক্রয় হইয়া থাকে। অতএব উহা দ্বারা যাহা আয় হইবে তাহা ১৫৲ কি ২০৲ টাকা বেতনের চাকুরের যথেষ্ট। ঐরূপ অল্প বেতনে নিজের দেহকে আবদ্ধ না রাখিয়া

যদি এক বিঘা মাত্র ইক্ষুর চাষ করা যায়, তবে আর শ্বস্তি করিতে হয় না।

ইক্ষুর দ্বিতীয় প্রকার আবাদে বৈশাখে বৃষ্টি হইলে, জমিতে ডগা বসাইলে চলিবে। এরূপ আকের আবাদে প্রথমে জল-সেচনের আবশ্যক হয় না, বৃষ্টির জলেই কাজ চলে। প্রথম বৃষ্টির পর ডগা বসাইয়া পুনরায় বৃষ্টি হইলে জো দেখিয়া 'চিয়েন খোঁড়' দিতে হয়। পরে আবার বৃষ্টি হইলে জো দেখিয়া সারমাটী দিতে হয়। আব সকলই প্রথম প্রকারের ন্যায় আবাদ করিতে হয়।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে আকের গোড়া হইতে বাঁশের কোঁড়ার ন্যায় ফড় বাহির হইতে থাকে। এজন্য এই দুই মাসে বৃষ্টি না হইলে জল সেচন আবশ্যক। কারণ এই সময়ে মাটী সরস থাকিলে, ঐ ফড়গুলি সবল হইয়া উঠে ও অধিক পরিমাণে ফড় বাহির হইতে থাকে। এই ফড়গুলি দ্বিতীয় বর্ষে ইক্ষুরূপে পরিণত হয়। পৌষ ও মাঘ মাসে শীত পড়ায় জল সেচনের আবশ্যক হয় না; কিন্তু ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে শীতের অবসান হয় ও রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠে। সেজন্য তখন ১৫ দিন অন্তর জল সেচন আবশ্যক হয়। এই সকল ফড় যাহাতে গরু বাছুরে নষ্ট না করিতে পারে, সেজন্য শক্ত করিয়া বেড়া দেওয়া আবশ্যক। ফাল্গুন মাসের মধ্যে ফড়গুলি রাখিয়া সমুদয় আকগুলি কাটিয়া লইলে বহু সংখ্যক ফড় বাহির হইতে থাকে এবং চৈত্র মাসে জমিতে জো দেখিয়া ঐ জমি কোপাইয়া দিতে হয় এবং গোময়

সার ১০ গাড়ী অথবা পুষ্করিণীর শুষ্ক পাঁক গাড়ী করিয়া আনিয়া, ঐ সকল ঝাড়ের গোড়ায় দিতে হয়। বৈশাখে বৃষ্টি হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে, খইল দিয়া, সার মাটী দিয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় বর্ষে বৈশাখ মাসেই দুই তিন হস্ত পরিমিত ইক্ষু হইয়া পড়ে এবং আশ্বিন মাসের মধ্যে ৮।৯ হাত করিয়া ইক্ষু হয়। তৃতীয় বর্ষেও প্রথম বর্ষের ন্যায় আবাদ করিতে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষেও প্রথম বর্ষের ন্যায় আবাদ করা হয়। কিন্তু ইক্ষু প্রথম বর্ষের অপেক্ষায় অনেক বড় হয় ও উৎপন্ন ফসলের মূল্য প্রথম বর্ষ অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া থাকে।

যদি কেহ আমার উপদেশ মত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, আমার তাঁহার নিকট অনুরোধ, যেন প্রথম বর্ষে ঐ এক বিঘা আকের চাষ ব্যতীত, অন্য কোনও ফসল আবাদ করিবার চেষ্টা না করেন। তাহা হইলে ইক্ষুর আবাদে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারিবেন না। সম্পূর্ণ আত্ম-নিয়োগ ব্যতীত ঐ কার্য্যে সফলকাম হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি কোন রকমে একটী 'জো' নষ্ট হইয়া যায়, তবে সে বৎসরের মত ফসলটীই নষ্ট হইয়া যাইবে। পরে বিস্তৃত আকারে চেষ্টা করার শক্তিও থাকিবে না বা ইচ্ছাও থাকিবে না। কায্য আরম্ভ করার পূর্ব্বে যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তবে বিশেষভাবে উপদেশ দিতে পারি ও আমার নিজের ইক্ষুক্ষেত্র দেখাইতে পারি।

কলার চাষ

কোন স্বল্পবিত্ত উৎসাহী যুবক কৃষি কার্য্যের দ্বারা জীবন-যাপন করিতে যদি ইচ্ছা করেন তবে কলার চাষ বিশেষ ভাবে উপযুক্ত। কলার চাষ বেশ লাভজনক এবং চারি বিঘা জমিতে কলার চাষ করিলে একটী ছোট খাট গৃহস্থের সংসার চলিয়া যাইতে পারে।

বর্ষার অবসানে জমিতে জো থাকিতে থাকিতে চাষ দিতে হয়। একত্রে চারি বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়া শক্ত করিয়া বেড়া দেওয়া আবশ্যক। যদি চারি বিঘা জমি এক সঙ্গে আবাদ করার সঙ্গতি না থাকে তবে প্রথম বর্ষে দুই বিঘা জমি করা উচিত। চারি বিঘা জমির মধ্যস্থলে লম্বালম্বি বার হাত প্রশস্ত একটি জমি বাদ দিয়া ঐ জমির উত্তর ধারে প্রথম বর্ষে কলার তেউড় বা চারা বসান আবশ্যক।

হেমন্তকালে জমি ভালরূপ কর্ষণ করিতে হইবে। ঐ সময়ে জমি ভালরূপ কর্ষিত হইলে যে ফসলই কেন দেওয়া যাউক না তাহা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা :—

"হেমন্তে কৃষ্যতে হেমঃ
বসন্তে তাম্র রৌপ্যকম্।
ধান্যং নিদাঘকালেতু
দারিদ্র্যন্তু ঘনাগমে॥"

জমি ভাসরূপ আবাদ হওয়ার পর যদি অগ্রহায়ণে বৃষ্টি হয় তবে ঐ জমিতে ছোলা অথবা মসুর বুনিয়া দিলে কিছু দাউলের সংস্থান হয়। এইরূপ রবিশস্য বুনন করার পূর্ব্বে জমিতে অন্ততঃ আটটি চাষ হওয়া আবশ্যক। রবিশস্য উৎপন্ন করিতে হইলে কার্ত্তিক মাসে জমি চারি বিঘা সম্পূর্ণ বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দিতে হইবে নতুবা ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে ঘিরিয়া দিলেও চলিবে। বেড়াটী খুব শক্ত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে গরু ছাগল কোনরূপে প্রবেশ করিতে না পারে।

বৈশাখে বারিপাত হইলে তিনটী চাষ দিয়া মৈ দ্বারা জমি সমতল করিয়া দিতে হয়। কলার জমিতে প্রথম বর্ষে বেগুন দিলে সুন্দর বেগুন হইতে পারে। বেগুনের চারার মধ্যে আট হাত অন্তর এক হাত গর্ত্ত করিয়া কলার চারা বসাইয়া দিতে হয় এ সম্বন্ধে খনার বচন বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্লোকটা দেওয়া গেল :—

"আট হাত অন্তর একহাত খাই
কলা পোতগে চাষা ভাই ॥
তিনশ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে
থাকগে চাষা খাটে শুয়ে ॥
কলা পুঁতে না কাটবে পাত
তাতেই কাপড় তা'তেই ভাত ॥"

কলা নানা জাতীয় আছে। কিন্তু সাধারণতঃ ঠেঠে, মর্ত্তমান, চাঁপা, দয়াকলা ও কাঁচকলার আবাদ হইয়া থাকে। এই

কয় জাতীয় কলার মধ্যে দয়াকলা, কাঁচকলা, ঠেঠে ও চাঁপা কলার চাষ সহজ সাধ্য, আমার মতে চাঁপা কলার গাছই অধিকসংখ্যক বসান আবশ্যক। চাঁপা কলা যত অধিক পরিমাণে জন্মে এমন আর কোন কলাই জন্মে না। চাঁপা কলার এক একটি কাঁদি এত বড় হয় যে তাহার মূল্য ২৲ টাকা ২।০ পর্য্যন্ত হইতে পারে। অন্য কলার কাঁদির মূল্য অর্দ্ধেকেরও কম হয়। এজন্য আমি চাঁপা কলার আবাদ করিতে সকলকে উপদেশ দিই। চাঁপা কলার চারা হুগলী জেলার অন্তর্গত সেওড়াফুলি বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

চারি বিঘা জমিতে কলার আবাদ করিতে যে খরচ পড়ে নীচে প্রদত্ত হইল।

প্রথম বর্ষ

১। ৴৪ বিঘা জমিতে ৮টী চাষ দিতে প্রতি লাঙ্গল ১৲ হিঃ ... ... ৩২৲

২। বেড়া দেওয়ার খরচ ... ৫০৲

৮২৲

দ্বিতীয় বর্ষ

১। বৈশাখে তিনটী চাষ দেওয়া খরচ প্রতি লাঙ্গল ১৲ হিঃ ... ... ১২৲

২। চাঁপা কলার তেউড় বা চারা শতকরা ৫৲ হিঃ ৪০০ চারার মূল্য ... ... ২০৲

৩। ঐ চারা আনার খরচ ... ১০৲

৪। ঐ চারা জমিতে বসানর খরচ জনপ্রতি ৷৷০ হিঃ ৪টা জনের মজুরী ... ... ২৲

৫। কলার জমিতে চাঁচ দেওয়ার খরচ ২৪টা জনের মজুরী ৷৷০ হিঃ ... ... ১২৲

৬। ঐ চাপান দেওয়ার খরচ ... ৲

৭। কার্ত্তিক মাসে তিনটা চাষ দেওয়ার খরচ ২১৲

৮০৲

তৃতীয় বর্ষ।

১। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথই দফার ব্যয় ১২৲

২। দ্বিতীয় বর্ষে ৫ই, ষষ্ঠ ও সপ্তম দফার লিখিত ব্যয় ৩৬৲

৩। কার্ত্তিকমাসে :কলাগাছের গোড়া পরিষ্কার করা পুরাতন গাছের (অর্থাৎ যে সকল গাছে কলা হওয়ায় কাটিয়া ফেলা হইয়াছে) গোড়া অর্থাৎ এটে তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত চারাগুলি উঠাইয়া ফেলার জন্য জন প্রতি বিঘায় ৪টী হিঃ ১৬টা জনের মজুরী ৷৷০ হিঃ ... ৮৲

৪। ফাল্গুন মাসে কলাগাছের গোড়ায় মাটী দেওয়ার খরচ প্রতি বিঘা ১০৲ হিঃ ৪০৲

৯৬৲

কদলীর ক্ষেত্র সর্ব্বদাই তৃণ শূন্য রাখা আবশ্যক, সেজন্য বৈশাখে বারিপাত হইলে জমিতে তিনটী চাষ দিয়া সিড়ী দ্বারা ভূমি সমতল করিয়া দিতে হইবে। পরে বৃষ্টি হইলে দ্বিতীয় বর্ষের ৫ম দফায় লিখিত চাঁচ দিতে হয় এবং পুনরায় বৃষ্টি হইলে ৬ষ্ঠ দফার লিখিত চাপান দিতে হয়। বাঁধ দিতে হইলে কোদাল দ্বারা মাটী চাঁচিয়া দুই হাত অন্তর দাঁড়া করিয়া দিতে হয়। ঐ দাঁড়ায় ঘাস জন্মিতে আরম্ভ করিলে ঐ দাঁড়ায় মাটী কাটিয়া দুই দাঁড়ার মধ্যস্থলে নূতন দাঁড়ার সৃষ্টি করিতে হয়, ইহাকে চাপান দেওয়া বলে। চাপানের সময় পুরাতন দাঁড়াগুলির আর অস্তিত্ব থাকে না। পরে আশ্বিন মাসে জো হইলে জমি লাঙ্গল দ্বারা চষিয়া দিলে কোন দাঁড়াই থাকে না।

দেশ ভেদে কলা বসানোর সময়ের ব্যতিক্রম আছে। যে দেশে মাটী শুষ্ক সে দেশে বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত কলা বসান হয়। যে দেশের মাটী সরস তথায় মাঘে বৃষ্টিপাত হইলে ঐ সময় হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত বসানর নিয়ম আছে। কলার পক্ষে দোয়াল মাটীই বিশেষ উপযোগী। সকল স্থানের মাটী কলার উপযোগী নহে। যে স্থানে কলা জন্মে না, তথায় কলার আবাদ করা উচিত নহে। ঐ সকল স্থানে কলা করিতে হইলে প্রথমে জমি প্রস্তুত করিতে হয় তাহা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। এই প্রবন্ধ স্বল্পবিত্ত ব্যক্তির জন্য লিখিত হইল সেজন্য ঐ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

যশোহর, খুলনা, চব্বিশ পরগণা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে কলাগাছ একটু পুরাতন হইলে কলার ভিতর তুলার বীজের ন্যায় বীজ উৎপন্ন হয় ও কলাগাছে একরূপ পোকা ধরিয়া ঝাড়গুলি নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য এতদ্দেশের লোকের বিশ্বাস কলাগাছ একস্থানে অধিকদিন থাকে না। এই ঘটনা আমি সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া মনে করি। কলার জমি রীতিমত আবাদ করিলে একস্থানে বহুদিন থাকিতে পারে।

প্রথম বর্ষে জমি প্রস্তুত করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে জমিতে কলার চারা বসাইয়া উপরোক্ত ভাবে লাঙ্গল, চাঁচ ও চাপান দিয়া আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জমিতে বেশ করিয়া চাষ দিয়া তৃণশূন্য করিয়া রাখিয়া দিলেই আবাদ বেশ হইল। তৃতীয় বর্ষে কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বর্ষের ন্যায় আবাদ করিয়া কার্ত্তিক মাসের শেষে প্রত্যেক ঝাড়ে দক্ষিণের দিকে দুইটী সরল চারা রাখিয়া বাকী চারাগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হয় ও পুরাতন গাছের গোড়াগুলিও উঠাইয়া গোড়ায় বেশ করিয়া মাটী দিতে হয়। ঐগুলি গরুর উপাদেয় খাদ্য। গরুর খাবারের জন্য যাহা লাগিবে তদ্বাদে বাকীগুলি কদলী ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত ফাঁকা স্থানে গাদা করিয়া রাখিয়া দিলে উহা পচিয়া যাইবে। ভবিষ্যতে ঐগুলি কলার বাগানে সাররূপে ব্যবহৃত হইবে। ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত ফাঁকা জমি হইতে মাটী কাটিয়া প্রত্যেক ঝাড়ের গোড়ায় দক্ষিণ দিকে অন্ততঃ

চারি ঝুড়ি করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পরবর্ত্তী বর্ষে তৃতীয় বর্ষের ন্যায় আবাদ করিতে হয়।

উপরোক্ত নিয়মে চারি বিঘা জমিতে কলা বসাইলে ৩৬৫ ঝাড় কলা বসান হইবে। প্রতি ঝাড়ে দুই কাঁদি কলা হইলে বৎসর ৭৩০ কাঁদি কলা উৎপন্ন হইবে। প্রতি কাঁদির মূল্য ॥০ হিসাবে ধরিলে ৩৬৫৲ টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা হইতে বাৎসরিক খরচ ১০০৲ টাকা বাদ দিলে ২৬৫৲ টাকা লাভ হইবে। এই আয় ১৫।২০৲ টাকার চাকুরের পক্ষে যথেষ্ট। এতদ্ব্যতীত মোচা বাসনা (কলার শুষ্কপাতা) কলার পাতা হইতে আরও কিছু আয় হইবে। যে সকল চারা কার্ত্তিক মাসে উঠাইয়া ফেলা হয় ঐ সকল চারার পাতই কাটিয়া বিক্রয় করা উচিত। যে সকল চারা রক্ষা করা হইবে তাহার পাত কাটা উচিত নহে।

মুস্কিল আসান

অনঙ্গবাবু একজন জাঁদরেল ডেপুটী। তিনি সাধারণের নিকট শার্দ্দুল সদৃশ হইলেও তাঁহার বেয়ানের নিকট একেবারে কেঁচোটী। কন্যার বিবাহ দেওয়ার পর হইতে তিনি তাঁহার বেয়ানকে কোনরূপেই খুসী করিতে পারেন নাই। কন্যাটি তাঁহার বড় আদরের—কাজেই পাছে কন্যার কষ্ট হয় এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই জড়সড়। তিনি প্রতি পর্ব্বে সাধ্যের অতীত ব্যয় করিয়াও কোন দিনই তাঁহার বেয়ানের নিকট বক্র মুখভঙ্গী ব্যতীত কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। কন্যার বিবাহ দিলে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইতে হইবে এজন্য যতদিন বিবাহ না দিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন ততদিন রাখিয়াছিলেন। বিবাহের তিন মাস যাইতেই তাঁহার বেয়ান পুত্রবধূকে লইয়া গিয়াছিলেন, পাঠাবার নামটী করেন নাই। ডেপুটী বাবু স্বয়ং কয়েকবার লইতে যাইয়া ক্ষুন্ন মনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কন্যাটী প্রত্যেক তত্ত্বের পর দ্রব্যের স্বল্পতার জন্য তাহার শ্বাশুড়ীর মুখভঙ্গীর বিষয় ও তজ্জন্য তাহার লাঞ্ছনার কথা জানাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে ডেপুটী বাবু যে কিরূপ মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত

কাহারও অনুভব করিবার শক্তি নাই। বলা বাহুল্য যে তাঁহার বেয়ান হইতেছেন জজের ঘরণী। ডেপুটী বাবু এবার মনস্থ করিয়াছিলেন যে পৌষ তত্ত্বে বেয়ানকে খুসী করিতেই হইবে।

একদিন ডেপুটী বাবু কাছারী যাইলে তাঁহার বৈবাহিকের একখানি পত্র হস্তগত হইল। ঐ পত্রে লেখা আছে—"আমার গৃহিণী গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন। অবস্থা শঙ্কটাপন্ন, কবিরাজে মানমণ্ডের ব্যবস্থা দিয়াছেন। আপনার দেশে ভাল মানকচু পাওয়া যায় সত্বর কিছু পাঠাইয়া দিবেন। ডেপুটী বাবুর বাটী যদিও যশোহর কিন্তু তিনি বর্ত্তমানে যশোহরে নাই—মান কি প্রকারে সংগ্রহ করিবেন; তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেদিন দুশ্চিন্তায় এজলাসে বসিয়া কাজ করিতে পারিলেন না। অধিকাংশ সময়ে খাস কামরায় বসিয়া কাটাইয়া দিলেন। বাটীতে এমন কেহ নাই যে তাহাকে বৈবাহিকের আদেশ পালন করিতে লিখিবেন। সেই দিন রাত্রিতে দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালরূপ নিদ্রাই হইল না।

ডেপুটী বাবু সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া শেষ রাত্রিতে একটু তন্দ্রাভিভুত হইলেন। তিনি দেখিলেন এজলাসে বসিয়া আছেন আর দুইটী বৃহৎ বৃহৎ মানকচু মাটীতে পড়িয়া আছে। উহার স্থানে স্থানে কামড়ের দাগ রহিয়াছে। ডেপুটী বাবু উহা দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "আহা এই মানকচু দুইটী যদি দাগী না হইত তবে উহার যতই মুল্য হউক না

কেন লইয়া বৈবাহিক মহাশয়কে পাঠাইলে তাঁহারা না জানি কতই আনন্দিত হইবেন।" এত বড় মানকচু ডেপুটী বাবু পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। এমন সময় একজন জীর্ণ শীর্ণ কৃষক আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল "হুজুর এই সজারু আমার বড় কষ্টের প্রস্তুত করা মান খাইয়া নষ্ট করিয়াছে—ইহার বিচার করুন।" তিনি দেখিলেন একটা সজারু ধুতি চাদর পরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া আছে—আর একটা শূকর সামলা মাথায় দিয়া উকীলের আসনে বসিয়া আছে। হাকিম বলিলেন "মানকচু খাইয়াছে তাহার কি বিচার করিব?" তখন কৃষক বলিল "আমি অনেক কষ্টে এরূপ কচু প্রস্তুত করিয়াছি। এরূপ কচু এক একটী ২॥০ টাকার কমে বিক্রয় কার না। এই সজারু প্রত্যেক দিন রাত্রিতে আসিয়া কচু খাইয়া যায়। আমি কিরূপ কষ্ট করে মান প্রস্তুত করিয়া থাকি শুনিবেন?" ডেপুটী বলিলেন "বল দেখি।" "আমি প্রত্যেক বৎসর এক বিঘা করিয়া কচুর আবাদ করি আর কোন ফসল আবাদ করি না। আর অধিক ফসল আবাদ করিবার শক্তিও আমার নাই।" ডেপুটী—"কি করিয়া আবাদ কর?" কৃষক "আশ্বিন মাসে ২॥০ হাত অন্তর একহাত গর্ত্ত করিয়া ও তাহার অর্দ্ধেক গোময় সার দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে এক একটী বড় চারা বসাইয়া দিই। পরে মাঘ কি ফাল্গুন মাসে ঐ জমিটী কোদাল দ্বারা খোঁড় দিয়া দিই। কিন্তু চারার গর্ত্তগুলি সেইরূপই রাখিয়া দিই। পরে বৈশাখে বৃষ্টি

হইলে মাটীতে জো দেখিয়া ১৫ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে চারাগুলির গোড়ার গর্ত্তগুলি গোময় সার দিয়া পূর্ণ করতঃ আর একটী খোঁড় দিয়া দিই। সকলের শেষে আষাঢ়ের শেষ বা শ্রাবণের প্রথমে জো পাইলে আর একটী খোঁড় দিয়া দিই। এবং পরে কচুর ক্ষেত্রে ঘাস জন্মিলে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিই ইহাতে এরূপ উৎকৃষ্ট কচু জন্মে।" ডেপুটী 'জো' কাহাকে বলে তাহা ত বুঝিলাম না?" কৃষক "মাটী শুষ্ক হইয়া যখন কর্দ্দম শূন্য হয় অথচ রস যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তখন জো হইয়াছে বুঝিতে হইবে।" ডেপুটী "তুমি এক বিঘা কচু ব্যতীত আর কোন ফসলের আবাদ করনা তাহাতে তোমার সংসার কি করিয়া চলে, রাত্রিতে কোন গুপ্ত ব্যবসা কর না কি?" কৃষক "দেখিতেছেন না আমার চেহারা ইহাতে কি রাত্রির ব্যবসা করা চলে বলিয়া আপনার বিশ্বাস হয়? আমার কচুর ক্ষেতে যাহা আয় হয় তাহাতেই আমার সংসার বেশ চলে।" ডেপুটী "কতটাকা প্রত্যেক বৎসর উহা হইতে পাও?" কৃষক "২॥ হাত অন্তর কচু বসাই, তাহাতে এক বিঘায় এক হাজারের উপর কচু জন্মে ঐ কচু প্রত্যেকটী।০ হইতে ২॥০ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া থাকি—তাহাতে আমি বৎসর চারি পাঁচ শত টাকা পাইয়া থাকি। এখন দেখুন কত কষ্ট করে খোঁড় দিয়া আমি কচু প্রস্তুত করি। সার বহিতে বহিতে আমার মাথার চাঁদি ফুটা হইয়া যায়।" ডেপুটী "তুমি নিজে অত কষ্ট না করিয়া

মুনিষ দিয়া কেন করাও না?" কৃষক "আমরা গরিব মানুষ অত টাকা কোথায় পাইব? মনে করুন যদি মুনিষ খরচ করিয়া কচুর আবাদ করিতে হয় তবে কচু বসাইতে ৮টী জনের মজুরী ॥৹ হিসাবে ৪ , দশ গাড়ী সার আনিতে গাড়ী ভাড়া ॥৹ হিসাবে ৫টী তিনটি খোঁড়ে ৪০টী জনের মজুরী ॥৹ হিসাবে ২০৲ টাকা, ঘাষ পরিষ্কার করিতে ৬৲ একুনে ৫৫৲ টাকা ঘর হইতে বাহির করিতে হয়। সার ও চারা যদি ক্রয় করিতে হয় তবে আরও ২০৲ টাকা ব্যয় পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু কচুর চারা আমাকে ক্রয় করিতে হয় না। আমার পূরাতন কচুর ক্ষেত্রেই যথেষ্ট চারা জন্মে। এখন বুঝিলেন ত আমি কত কষ্টে কচু প্রস্তুত করি। আর কিনা সজারুটা আসিয়া খাইয়া নষ্ট করিয়া যায়। তুই একটা খাবি খা, তা নয় এটায় এক কামড় ওটায় এক কামড় এইরূপে নষ্ট করিয়া দিয়া যায়। হুজুর ইহাকে ট্রেসপাস (Trespass) অনধিকার প্রবেশ, থেফ্‌ট (Theft) চুরি, ও মিসচিফ (Meischief) অনিষ্ট বা নষ্ট করা এই তিন অপরাধে শাস্তিবিধান করুন। ডেপুটী সজারুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কোন বক্তব্য আছে?"

সজারু—"হুজুর আমার কোন বক্তব্য নাই। আমার যাহা কিছু বলিবার আছে তাহা আমার উকীল সকলই বলিবেন।"

এই বলিয়া সামলাধারী শূকরকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। তখন শূকর উঠিয়া বলিতে লাগিল "হুজুর আপনি বিচারে

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, আপনাকে আর বিশেষ কি জানাইব। আমার মক্কেল নিরপরাধ। দেখুন কচুটা আখটা আমার ও আমার মক্কেলের জাতির প্রিয়, তাহা হুজুরের বিশেষভাবেই জানা আছে। আমরা ত আর চাষা নই যে চাষ করিয়া কচু খাইব। কাজেই যেখানে কচু দেখি সেইখানেই গিয়া খাইয়া আসি। কৃষক যে ট্রেস্‌পাসের অভিযোগ আনিয়াছে তাহা চলিতে পারে না। কারণ ঐ ক্ষেত্রে বেড়া দেওয়া ছিলনা, যদি শক্ত করিয়া বেড়া দেওয়া থাকিত আমার মক্কেল বুঝিত যে ঐ স্থানে যাইতে বাধা আছে, কাজেই আমার মক্কেল সরল বিশ্বাসে ঐ স্থানে গিয়াছিল, এরূপ ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ হইতে পারে না। মনে করুন আপনার বাটীর সংলগ্ন জমিতে যদি বেড়া না থাকে আর সেখান দিয়া লোকজন যাতায়াত করে তবে কোন ব্যক্তি বিশেষকে ঐ স্থান দিয়া যাওয়ার জন্য তাহার বিরুদ্ধে আপনি টেস্‌পাসের চার্জ্জ আনিতে পারেন কি? সেরূপ স্থলে উল্টা ইজমেণ্টেও (Easement) এর প্রশ্নই উঠিবে। দ্বিতীয় চার্জ্জ থেফ্‌ট (চুরি), উহা হইতেই পারে না। কচু ত জঙ্গলে আপনি হইতে পারে। উহা ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের জাতির জন্য আবাদ করিয়া থাকেন। ঐ জঙ্গলটা যে সেরূপ একটা জঙ্গল নয় তাহা আমার মক্কেল কি করিয়া বুঝিবে? অতএব আমার মক্কেলের কোন ক্রিমিন্যাল ইন্‌টেন্সন (Criminal intention) ছিল না। তৃতীয় চার্জ্জ মিস্‌চিফ, উহাও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না। যেহেতু আমার

মক্কেল উহা খাইয়াছে, নষ্ট করে নাই। ইহাতে যে কোন অনিষ্ট হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান ছিল না। আপনারা যে আম কাঁঠাল খাইয়া থাকেন তদ্দ্বারা কোন অনিষ্ট হইল বলিয়া মনে করেন? অতএব আমার মক্কেল যাহা কিছু করিয়াছে তাহা সরল বিশ্বাসে করিয়াছে, কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না, সে কারণ এই মোকর্দ্দমা অচল এবং আমার মক্কেল বেকসুর খালাস পাইবার যোগ্য।" এই বলিয়া শূকর চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। তখন ডেপুটীবাবু কৃষককে বলিলেন "বাবু তুমি জমিতে বেড়া দেও নাই কেন? এরূপ ক্ষেত্রে আমি কি প্রকারে শাস্তি দিই।" কৃষক "হুজুর বেড়া দিতে হইলে আরও ২০৲ কুড়ি টাকা বেড়ার খরচ পড়িয়া যায়। আর দেখুন ধানের ক্ষেতে ত বেড়া দেওয়া হয়না, তবে গরুতে ধান্য খাইলে আপনারা গরুকে পাউণ্ডে দেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন কেন?" শূকর তখন চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া বলিল "সে যে চাষার গরু। চাষা গরু ছাড়িয়া অন্যের ফসল নষ্ট করায় কেন? আর আমার মক্কেল ত কাহারও অধীন নয়, সে যে স্বাধীন জাতি।" কৃষক "যত দোষ চাষারাই করিয়াছে? জগতে চাষারাই যে কি পাপ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিতে পারি না। চাষাদের সর্ব্বত্রই নির্য্যাতন সহিতে হয়। জমিদারের নায়েব মহাশয়কে হিসাবানা পার্ব্বণী দিতে হইবে, নহিলে তিনি মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাকিবেন ও খাজনার টাকা লইয়া দাখিলা আট্‌কাইয়া রাখিবেন। নদীর জলে পাট পচাইতে দিলে পুলিশ আসিয়া

হাজির হইবেন, ঘুষ দাও নহিলে ফৌজদারী সোপরদ্দ হইতে হইবে। মহাজনে উৎপন্ন ফসল অর্দ্ধমূল্যে লইয়া যাইবে ও টাকা দিলে উশুল ছাট করিয়া নালিশ করিবে। আর বনের জানো-য়ারে ফসল নষ্ট করিবে। আমি আজই চাষ ছাড়িয়া দিব ও ছেলেগুলোকে ইস্কুলে দিব। তাহারা লেখা পড়া শিখিয়া যখন হাকিম হইয়া বসিবে তখন পুনরায় এজলাসে আসিব দেখিব তখন সুবিচার হয় কিনা।" এই বলিয়া কৃষক গড় গড় করিতে প্রস্থান করিল এবং ডেপুটী বাবুরও সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন বেলা তখন প্রায় ৮টা।

সেইদিন এজলাসে যাইয়াই তিনদিনের ছুটীর দরখাস্ত করিলেন এবং বাটী যাইয়া একবস্তা কচু বৈবাহিকের জন্য পার্শ্বেল করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। নিজের জন্য দুই চারিটা লইয়া আসিলেন। বাটীতে যে চাকর ছিল তাহাকে বলিয়া আসিলেন বাটীর সংলগ্ন যে এক বিঘা জমি আছে তাহাতে আগামী বর্ষে কচু বসাইয়া দিও। ঐ স্বপ্ন দৃষ্ট কৃষকের নির্দ্দেশ মত আবাদ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া গেলেন। শুনা গিয়াছে পরবর্ষে এক্ষেত্রে যেরূপ কচু হইয়াছিল তাহাতে ডেপুটী বাবুর সে বৎসরের বাজার খরচ চলিয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রতি সপ্তাহে এক এক বস্তা করিয়া কচু ও তৎসহ কিছু দৈ তাঁহার বৈবাহিকা ঠাকুরাণীকে পাঠান হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে তাঁহার বৈবাহিকা ঠাকুরাণী সে পর্য্যন্ত কষ্টকর ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। এইরূপ

ক্রমাগত কচু ব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইলেন এবং তাঁহার গম্ভীর মুখে হাসি দেখা দিল। তাহার অল্পদিন পরেই একখানি পত্র ডেপুটী বাবুর গৃহিণীর হস্তগত হইল, তাহাতে লেখা আছে—"বেয়ান বৌমাকে অনেকদিন রাখিয়াছি, বেয়াইকে আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে বলিও। বৌমা আমার বড় লক্ষ্মী, অসুখের সময় আমায় কত যত্ন করিয়াছেন, একবার বাপ মাকে দেখুন দিয়া।" এবার ডেপুটী বাবু কন্যা আনিতে গিয়া বেয়ানের আন্তরিক আদর যত্ন ও গালভরা হাসির সহিত বিষম মুস্কিল হইতে চিরতরে আসান পাইলেন।

খর্জ্জুর বৃক্ষের আবেদন

হে যুবকগণ, তোমাদের নিকট আমার একটী আবেদন। বিদেশী গাছগাছড়ার কথা লইয়া সাহিত্য-জগতে কতই না আলোচনা হইয়া থাকে; কিন্তু আমার কথা কাহাকেও মুখে আনিতে দেখিনা। বিদেশী অদ্ভুত অদ্ভুত বৃক্ষের অপেক্ষা আমি কিসে হীন তাহা তোমরা আমাকে বুঝাইতে পার কি? অনেকদিন হইতে আশা করিয়া বসিয়া আছি যে আমার স্বদেশবাসিগণের মধ্যে কেহ না কেহ একদিন আমার গুণের কথা জগতের সম্মুখে প্রচার করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও প্রকৃত গুণগ্রাহী দেখিলাম না, কাজেই নিজের গুণের কথা নিজের মুখে প্রচার করিতে হইতেছে। সেকালে এরূপ আত্মপ্রশংসা করিলে আত্মঘাতী হওয়ার ফল হইত, তাহার সাক্ষী অর্জ্জুন। আর তোমরা সকলেই জান রাজা হরিশ্চন্দ্র নিজের গুণের কথা নিজে বলায় স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। আমি ত আর নব্য নহি কাজেই নিজের গুণের কথা নিজে প্রকাশ করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু আজকাল দেখিতেছি ইংরাজের রাজত্বে নিজের গুণের কথাই নিজেকে বলিতে হয়। চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিতে হইলে

নিজের গুণের কথা নিজেকেই বলিতে হয় নহিলে চাকুরী মিলেনা। ভোট যুদ্ধে নিজের গুণের কথা লিখিয়া 'প্লাকার্ড' ছাপাইয়া প্রচার করিতে হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মুখ খুলিতে সাহসী হইতেছি। 'যস্মিন্ কালে যদাচার' অতএব আমার নিজের গুণের কথা নিজে বলাতেই বা ভয়ের কারণ কি? বিশেষতঃ আমি আমার স্বার্থের জন্য কোন কথা বলিতেছিনা। আমি যাহা কিছু বলিব তাহাতে আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই। তোমাদের হিতসাধনই আমার উদ্দেশ্য। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার চারুপাঠে পান্থপাদপের কতই গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ বৃক্ষের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিলে সুপের জল নির্গত হয় ও তাহা পান করিয়া মরুবাসিগণ পিপাসার শান্তি করিয়া থাকে। কিন্তু আমি যে সুমিষ্ট ফল প্রদানে ঐ মরুবাসীদের ক্ষুধার শান্তি করিয়া দিই তাহা কিন্তু তিনি উল্লেখই করেন নাই। কথায় বলে "গেঁয়ে যোগী ভিক্ষে পায় না।" আমি তোমাদের স্বদেশবাসী কিনা, কাজেই আমার প্রতি তোমাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। পান্থপাদপ কেবলমাত্র জল প্রদান করে কিন্তু আমার গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিলে আমি কিরূপ সুমিষ্ট সরবৎ প্রদান করি তাহা কি তোমরা কখনও আস্বাদ করিয়া দেখ নাই? দত্ত মহাশয় না হয় সহুরে লোক কাজেই তিনি হয়ত আমার সুমিষ্ট রসাস্বাদনের সুযোগ পান নাই। যদিও তিনি কখনও আমার রস দুই এক পয়সার কিনিয়া খাইয়া থাকেন তবে খুব সম্ভব তাহা জল মিশান।

কিন্তু তোমরা ত আমার রস খাইয়া তোমাদের রসনাকে পরিতৃপ্ত করিতেছ; তবে আমার গুণের কথা প্রচার করা তোমাদের কর্ত্তব্য ছিল না কি? তোমরা বি, এ—এম-এ পাশ করিয়া ঘরে বসিয়া 'হা অন্ন দে অন্ন' করিতেছ তথাপি আমার প্রতি তোমাদের লক্ষ্য নাই। তোমরা যদি আমার শরণাপন্ন হও তবে দেখিবে আমি তোমাদিগকে স্বাবলম্বী করিতে পারি কিনা? তোমরা যদি দশ বিঘা জমি লইয়া আমার পোষণ কর, তবে আমি তোমাদের কার্ত্তিক মাসের ১৫ই হইতে চৈত্র মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত প্রত্যহ অন্ততঃ ৩/ মণ হিসাবে গুড় দিতে পারি। প্রতি মণ ৪৲ হিসাবে ধরিলে ও দৈনিক ১২৲ হিসাবে প্রতি মাসে ৩৬০৲ করিয়া ঐ ৫ মাসে ১৮০০৲ টাকা দিতে পারি। উহার মধ্যে ৯০০৲ টাকা যদি খরচ বাদ দেওয়া যায় তবে ঘরে বসিয়া স্বাধীন ভাবে তোমাদের মাসিক আয় হইবে অন্ততঃ ৭৫৲ টাকা। বর্ত্তমান সময়ে ইহার অপেক্ষা তোমরা আর কি আশা করিতে পার? এই আয়ে যদি তোমাদের আকাঙ্ক্ষা না মিটে তবে জমির পরিমাণ দ্বিগুণ বা তিনগুণ করিয়া লইতে পার, সে তোমাদের পুরুষকারের উপরই নির্ভর করিতেছে। তোমরা হয় ত পুরুষকার মানিতে চাহিবে না। অলস ব্যক্তি তাহাই করে; কিন্তু তোমাদের উহা একটী ভুল বিশ্বাস। পুরুষকার দ্বারা ভাগ্যকে পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়। ভাগ্য কর্ম্মফল হইতেই যে উদ্ভব হয়, ইহা যদি তোমরা স্বীকার কর তবে উহা কেন পরিবর্ত্তিত হইবে না? পূর্ব্ব জন্মের

কর্ম্মফল যদি ভাগ্যরূপে দেখা দেয়, তবে বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত ফল এই জন্মে ফলিবে না তাহার অর্থ কি? কেহ কেহ অশেষ পাপাচরণ করিয়া শেষ জীবনে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে; তাহা তোমরা সদাসর্ব্বদা দেখিতেছ। অনেকে বেশ্যাদিগমন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপদংশ প্রভৃতি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া অশেষ কষ্ট পাইতেছে তাহা তোমাদের অবিদিত নাই। অতএব পাপের ফল যদি সঙ্গে সঙ্গে ফলে তবে তোমরা যে কোন কষ্ট করিবে তাহার ফল সঙ্গে সঙ্গে যে ফলিবে না, তাহা তোমাদের কে বলিল? অতএব দৈবকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা পুরুষকার কর। দৈব যদি প্রতিকূল থাকে তবে প্রাণান্ত পণ করিয়া অধ্যবসায় করিতে হয়—তখন দৈবকে অনুকূল হইতেই হইবে। যেখানে পুরুষকার করিয়া ফললাভ হয় নাই তথায় আন্তরিক অধ্যবসায়ের অভাব আছে ইহা সুনিশ্চিত।

যাউক, তোমাদের সঙ্গে বাজে বকিয়া লাভ নাই। এক্ষণে কাজের কথা বলি। কি করিলে আমি তোমাদের অন্ন সংস্থান করিয়া দিতে পারিব তাহা শুন। প্রথমবর্ষে দশ কাঠা জমিতে পাঁচ গাড়ী গোময় সার দিয়া বেশ করিয়া চাষ দিয়া দুই হাজার খর্জ্জুরের বীজ ছিটাইয়া দিয়া মৈ দিয়া দিও। এইরূপ বীজ বপন জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যে করিতে পারিলে ভাল হয় অন্যথায় তৎপরে যত শীঘ্র পারা যায় করিতে হইবে। ঐ সকল বীজ হইতে চারা বাহির হইলে ঐ ক্ষেত্রে আগাছা বা ঘাস যাহা

বাহির হইবে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিও। দ্বিতীয় বর্ষে জমিটী ঘাসশূন্য করিয়া রাখা ব্যতীত আর করণীয় কিছুই নাই। তৃতীয় বর্ষে যে জমীতে ঐ সকল চারাগুলি বসাইতে হইবে সেই জমিটা ভালরূপ চাষ দিয়া ভাদুই ধান্য বুনন করিয়া দিবে ধান্যগুলিকে নিংড়াইয়া দিয়া উপরোক্ত চারাগুলি উঠাইয়া আট হাত অন্তর সারি দিয়া বসাইয়া দিবে। ধান্য কাটিয়া লইয়া জমিতে বেশ করিয়া চাষ দিয়া মসূর প্রভৃতি রবি শস্য বুনন করিয়া দিবে। এইরূপে ছয় বৎসর পর্য্যায় ক্রমে ঐ জমিতে ভাদুই ধান্য ও রবিশস্যের আবাদ করিবে। তৎপর বর্ষ হইতে ঐ চারাগুলি রস উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। ঐ জমিতে ধান্যের আবাদ না করিয়া কলার আবাদ করিলে বিশেষ সুবিধা হয়। প্রত্যেক কলার ঝাড়ের উত্তরভাগে এক একটী খর্জ্জুরের চারা বসাইয়া দিলে আর কিছুই করিতে হয় না। কলার আবাদ করিলে উহার আবাদ হইয়া যায় কেবলমাত্র উক্ত চারাগুলির গোড়ায় ঘাস থাকিলে পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। পরে চারাগুলি রস প্রদানের উপযুক্ত হইলে কলার গাছগুলি মারিয়া ফেলিলেই হইল। কলার আবাদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

আট হাত অন্তর খেজুরের চারা বসাইলে প্রতি বিঘায় ১০০ চারা বসিবে এবং ১০/ বিঘায় ১০০০ বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারিবে। ঐ হাজার বৃক্ষ হইতে প্রতি সপ্তাহে গড়ে এক কলস হিসাবে ১০০০ কলস রস পাওয়া যাইবে, তাহাতে ১০০০ সের

অর্থাৎ ২৫/ মণ গুড় উৎপন্ন হইতে পারিবে। এই গুড়ের মূল্য প্রতিমণ ৪৲ হিসাবে ধরিলে প্রতি সপ্তাহে ১০০৲ হয়। তাহাতেই মাসে ৪০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। এই কার্য্য বৎসরে পাঁচ মাস মাত্র চলে অতএব পাঁচ মাসে ২০০০৲ টাকা পাইবে ইহার অর্দ্ধেক খরচ বাদ দিলে প্রতি বৎসর ১০০০৲ টাকা আয় হইতে পারিবে।

সুদীর্ঘ কাণ্ড বিশিষ্ট ধান্য

আমাদের দেশে অনেক বিল বা জলা পতিত জমি আছে। যাহাতে বর্ষায় আটদশ হাত জল হয় কিন্তু চৈত্র কি বৈশাখ মাসে জমি শুষ্ক হইয়া যায়। ঐ সকল জলা পতিত জমিতে কোন শস্য উৎপন্ন হয় না। ঐ সকল স্থানে সুদীর্ঘ কাণ্ড বিশিষ্ট ধান্য বুনিয়া দিলে অনায়াসে জন্মিতে পারে। ঐ ধান্যের বিষয় পশ্চিম বঙ্গের কৃষকগণ বড় জ্ঞাত নহেন, একারণ ঐ সকল জমি হইতে কোন ফসলই পাওয়া যায় না।

জলা পতিত জমিতে প্রায়ই বেনাখড় বা অন্যান্য দাম এরূপ জন্মে যে তাহা পরিষ্কার করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার কাজেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত কৃষককুল ঐরূপ শ্রমসাধ্য কাযে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। কিন্তু ঐ সকল জঙ্গল একবার পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিলেই অনায়াসে উক্ত ধান্য আবাদ করা চলে। ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে, যেখানে বন্যায় দেশ ভাসিয়া যায় সেই সকল স্থানে উক্ত ধান্যের আবাদ হইয়া থাকে। ঐ ধান্যের সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ এই যে যদি ক্ষেত্রে প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয় তবে অনেক সময় স্রোতের বেগে ধান্যের গাছ গোড়া ছিন্ন হইয়া ভাসিয়া যায়। কিন্তু ঐ ছিন্ন গাছগুলি যে

জমিতে গিয়া আট্‌কাইয়া যায় সেই জমির জল কমিয়া যাইলে ঐ গাছগুলি মাটীতে গিয়া পড়ে ও প্রত্যেক গিরায় শিকড় বাহির হইয়া সেই স্থানে ধান্য জন্মিয়া থাকে। যাহার জমিতে উহা আটকাইয়া যায় সে বিনা আবাদে ধান্য প্রাপ্ত হয় ও যে পরিশ্রম করিয়া আবাদ করে তাহার পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। অবশ্য প্রবল স্রোত না হইলে ঐরূপ বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

জল যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক না কেন ঐ ধান্যের গাছও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে থাকে। ২৪ ঘণ্টায় ঐ ধান্য—একফুট করিয়া বৃদ্ধি পায় এবং কুড়ি ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। ধান্য বৃদ্ধি পাইয়া অনেক সময় জলের উপর ভাসিতে থাকে কাজেই উহাকে সহজে বন্যায় ডুবাইতে পারে না। অন্যান্য ধান্য যেরূপ গোড়ায় ঝাড় করে ইহা সেইরূপ ডগায় ঝাড় করে এবং যদি কার্ত্তিক কি অগ্রহায়ণ মাসে জল খুব কমিয়া যায় অর্থাৎ গাছগুলি যদি মাটীতে গিয়া পড়ে তবে ঐ গাছের প্রত্যেক গিরায় শিকড় বাহির হইতে থাকে এবং বহু শাখা-বিশিষ্ট হইয়া প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপাদন করে। যে সকল জমিতে জল সরিয়া যাইবার উপায় নাই ঐ সকল ক্ষেত্রে বীজ অধিক পরিমাণে ফেলিতে হয়।

এই ধান্য পৌষ কি মাঘ মাসের প্রথমে পরিপক্ক হয়। উহা হইতে যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহা আউস চাউলের অনুরূপ এজন্য ইহা সৌখিন বাবুদের ব্যবহার্য্য নহে।

জমির জল শুষ্ক হইয়া জমিতে জো হইলেই লাঙ্গল দিয়া জমি আবাদ করতঃ ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে ধান্য বুনন করা আবশ্যক। অন্ততঃ পক্ষে বৈশাখ মাসের মধ্যে চারাগুলি বাহির হওয়া আবশ্যক। বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া জমিতে জল হইবার পূর্ব্বে ধান্যের গাছগুলি অন্ততঃ একফুট না হইলে ডুবিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। ধান্য কাটিয়া লওয়ার পর ধান্যের গাছগুলি জমিতে থাকায় উহাতে লাঙ্গল চালান সম্ভবপর হয় না। সেজন্য ঐ গাছগুলি শুষ্ক হইলেই অগ্নি সংযোগ করিয়া দিতে হয় যে গাছগুলি ভস্ম হইয়া যাওয়ায় জমি পরিস্কার হয় ও ঐ উত্তাপে জমিতে যে কর্দ্দম থাকে তাহাও অনেকটা শুষ্ক হইয়া যায় এবং শীঘ্র আবাদের উপযুক্ত করে। সাধারণতঃ বিল জমিতে যেরূপ ধান্যের আবাদ করিতে হয় ইহার আবাদও তদ্রূপ করিতে হয়। নিড়ানি দ্বারা ঘাসগুলি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ধান্যের গোড়ায় জল জমিলে আর কিছুই করিতে হয় না।

যাঁহাদের ঐরূপ জলা পতিত জমি আছে তাঁহারা যদি পরীক্ষা করিয়া দেখেন তবে বিশেষ লাভবান হইবেন এরূপ আশা করা যায়। এই ধান্যের বীজ গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগে দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইতে পারে। যদি কাহারও সুবিধা থাকে তবে ঢাকা বা মৈমনসিংহ জেলার যে স্থানে বর্ষায় গ্রামগুলি জলপ্লাবিত হয় সেই সকল স্থানে চেষ্টা করিলে এই ধান্যের বীজ যথেষ্ট পরিমাণে ও অল্প মূল্যে পাইতে পারিবেন।

বাঁচিবার উপায়

প্রতি বিঘায় দশসের করিয়া বীজ বপন করিতে হয় কিন্তু যদি কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে ধান্যের গোড়া হইতে জল সরিয়া যাইবার সম্ভাবনা না থাকে তবে বীজ পনর সের ফেলা উচিত।

স্বাধীন জীবিকা

অন্নং প্রাণাঃ বলং চান্নং
অন্নং সর্ব্বার্থ-সাধকম্ ;
দেবাসুর মনুষ্যাণাং
সর্ব্বেচান্নোপজীবিনঃ।
অন্নস্তু ধান্যসম্ভূতং
ধান্যং কৃষ্যাবিনা ন চ ;
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য
কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ।

'কিহে চুপ করে বিমর্ষভাবে বসে আছ যে?' গ্রামের গদাধর সাংখ্য-বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় তাঁহার বাল্য-বন্ধু রসময় রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন।

'আর ভাই কি করব? ছোঁড়া স্বর্গ থেকে একেবারে পাতালে ফেলে দিয়েছে।'

'কি হয়েছে ভেঙ্গে বল না।'

'কি আর ছাই বলব? যতেটা এমন সুন্দর চাকরীটে ছেড়ে চলে এসেছে। আড়াই শ' টাকা করে মাইনে পাচ্ছিল। আহা! এমন চাকরী কি আর জুটবে?'

'বল কি ভাই? এ দুর্ব্বুদ্ধি তা'কে কে দিলে?'

'দুর্ব্বুদ্ধি আর কে দেবে? শ্রীমানেরই মস্তিষ্ক বিকৃতি আর আমাদের দুরদৃষ্ট। মনে করেছিলাম এবার দুর্গোৎসব করব। বৌ ঠাকরুণও কত আনন্দ করছিলেন তা' সকল তাতেই ছাই পড়ল। এমন কি ভাগ্য করেছি যে মা আমাদের বাড়ীতে আসবেন? আস্তাকুড়ের পাত কি আর ভাই স্বর্গে যায়?'

'এমন সুন্দর চাকরী হঠাৎ ছেড়ে দিল কেন তা' কি কিছু বলেছে?'

'সাহেব নাকি কান মলে দিয়েছিলেন, তাই উনি সাহেবের গালে চড় মেরে পাল্‌টা জবাব দিয়েছিলেন।'

'বলো কি? সাহেবের গালে একেবারে চড়? সর্ব্বনাশ! এখনকার ছেলেদের রকম দেখে অবাক হতে হয়। তুই বাবু অপরাধ না করলে কি আর সাহেব কাণ মলে দিয়েছে? আর দিলই বা কাণ মলে—অন্নদাতা ত বটে।'

'ভাই যখনই শুনলাম যে বাবাজী সাহেবের গালে চড় মেরেছেন, তখনই আমার মাথাটা বোঁ করে ঘুরে উঠল। যা হোক্ উনি যে প্রাণে প্রাণে ফিরে এসেছেন এই পিতৃ-পুরুষের পরম ভাগ্য। বংশের একমাত্র সন্তান।'

'ভায়া! বাবাজি যখন ম্লেচ্ছদেশ হ'তে এসেছেন, তখন একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দাও, আর এদেশে একটা ভাল চাকরী জোগাড় করে নিতে বল। আর ম্লেচ্ছের দেশে গিয়ে কাজ নেই।'

'এদেশে কি আর অত মাইনে হবে। তা ছাড়া সে আর চাকরী করতেই রাজী নয়। আজকাল যে রকম সময় পড়েছে তাতে ২০।২৫ টাকার চাকরী পাওয়াই কঠিন হ'য়ে পড়েছে। অত টাকার চাকরী পাওয়া ত দূরের কথা। কথায় বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়! অদৃষ্ট ভাই অদৃষ্ট! আমার আর কি বল? ক'দিনই আর বাঁচবো। তবে তার কষ্ট চোখে দেখে যেতে না হয়, তাই-ই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি। বিষয়ের মধ্যে আছে কেবল ঐ আমের বাগানটা আর ঐ কয় বিঘে জমি। তাও বরগাদার অভাবে পড়েই আছে। আমন-ধানের জমি কয় বিঘে কোনমতে আবাদ হয়, তা' এতে কি আর সংসার চলে? দ্রব্যসামগ্রী যেরূপ দুর্মূল্য হ'য়ে পড়েছে। ছেলেটা রোজগার করছিল; মনে ভাবলাম এবার আশ্বিন মাসে মাকে বাড়ীতে আনবো। এখন পুনর্মূষিকো ভব হতে হল।'

'খুড়ো মশায় দুঃখ করবেন না। আশ্বিন মাসে মাকে আনবেন, তাতে কোনও বাধা হবে না।' এই বলিয়া যতীন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল এবং গদাধরকে দেখিয়া প্রণাম করিল।

গদাধর প্রশ্ন করিলেন—'বাবাজি কেমন আছ? সে দেশ কেমন? ঐ দেশটার নাম আথরিকা না কি?'

'হাঁ খুড়া মশায়, ঐ দেশটাকে আফ্রিকা বলে।'

'ঐ দেশটায় হিন্দুর বাস টাস আছে?'

'হাঁ অনেক হিন্দু এদেশ থেকে গিয়ে বাস করছেন বটে কিন্তু তাঁদের আর থাকা চলে না।'

'থাকা চলবে না কেন?'

'থাকা আর চলবে কি করে খুড়া মশায়? সাহেবেরা নতুন নতুন আইন পাশ করে যাতে ভারতীয়গণ সেখানে কোনরূপ সুবিধে না পান ও থাকতে না পারেন তারই ব্যবস্থা করছেন।'

'হাঁ ইহা সমীচীন তাঁদের ত দেশ বটে।'

'তাঁদের দেশ কি করে হল। সাহেবেরা ত আফ্রিকার লোক নয়, তাদের দেশ হল ইউরোপ। তাঁরা তেড়ে গিয়ে জুড়ে বসেছেন।'

'হাঁ দেশ না হয়, তাদের তালুক ত বটে। করবে বই কি আইন।'

'তারা যদি আইন করে ভারতীয়দের সেখান হতে তাড়ায়, তবে আমাদের দেশে তারা থাকবে কোন অধিকারে?'

'সর্ব্বনাশ! অমন কথা মুখে এনো না। ওরা যেই এদেশে এসেছিল সেই রক্ষে, নইলে এদেশ এতদিন রসাতলে যেত। পিতৃদেবের মুখে শুনেছি'ডাকাতের ভয়ে সন্ধ্যের পর আর গ্রামের বাইরে যেতে পারা যেত না।

'কিন্তু তখন গ্রামে এমন দু' দশজন লোক পাওয়া যেত যাদের ভয়ে গ্রামে ডাকাত পড়তে সহসা সাহস পেত না।'

'হাঁ ঠিক ঠিক। তুমি ছেলে মানুষ এ সকল খবর কি করে

জানলে ? আমার খুড়া মশায় একবার মনোহরদের বাড়ী থেকে ডাকাত তাড়িয়েছিলেন।'

'এখন গ্রামে সে রকম লোক পাওয়া যায় কি ?'

'কৈ আর পাওয়া যায় ? গ্রামের উন্নতি কোথা ? দিন দিনই গ্রাম জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে। রোগে রোগে মানুষের আর সে শক্তি কোথায় ?'

'ম্যালেরিয়া ও কলেরায় মরে যত লোক না লোপ পেয়েছে তার বেশী গিয়েছে পলাতক হয়ে। যিনি চাকরী করতে বিদেশে যান, তিনি আর পাড়া গাঁয়ে বাস করতে পারেন না। পল্লীতে এলে তাঁদের স্বাস্থ্য টিকে না। যাঁরা বিদেশে থাকেন, তাঁরাই সাধারণতঃ শিক্ষিত ও উপার্জ্জনক্ষম আর গ্রামে যাঁরা থাকেন তাঁরা অধিকাংশই অশিক্ষিত ও অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম। বিদেশী হয়ে বাবুদের নিজগ্রামের উপর বড় নজর থাকেনা ও তাঁরা ক্রমে সহরে বাড়ী করে বসেন। যাঁরা চাকরী বা ব্যবসার জন্য বিদেশবাসী হয়েছেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে যে নিজ গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি করতে পারেন না, তা নয়। কিন্তু তাঁদের সে মন নেই। সহরে গিয়ে দশ বিশ এমন কি পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করে বাসের জন্য বাটী প্রস্তুত করতে পারেন কিন্তু গ্রামটিকে বাসের যোগ্য করবার জন্য একটা পয়সাও দেবেন না। পল্লী-বাসিগণ যে টাকা ব্যয় করে সহরে বাটী প্রস্তুত করেন, ঐ টাকার সিকি যদি নিজ নিজ পল্লীর স্বাস্থ্যের জন্য দান করতেন, তাহলে তাঁদের আর ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে যেতে হত না। দেখুন

বাঁচিবার উপায়

আমাদের গাঁয়ের মধুসূদন পোদ্দার মশায় কলিকাতায় সোনা-রূপার ব্যবসা করে বেশ অবস্থা ফিরিয়েছেন, গত বছরে তিন লাখ টাকা ব্যয় করে বাড়ী করেছেন। বলুন দেখি যদি তিনি ঐ টাকা সহরে ব্যয় না করে ঐ টাকার থেকে পঞ্চাশ হাজার গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যয় করতেন আর আড়াই লাখ টাকায় জমিদারী কিনতেন, তাহলে মন্দটা কি হত? তাঁরাও অনায়াসে গ্রামে বাস করতে পারতেন আর গ্রামটীও আনন্দ-ধাম হয়ে যেত। ঐ দেখুন সুরেন মিত্র মশায় পেনসন নিয়ে এসে বাড়ীতে থাকতে পারলেন না। ছ'হাজার টাকা দিয়ে চুঁচুড়ায় বাড়ী কিনলেন আর তার মেরামতেও আর তিন হাজার ব্যয় করলেন। হাতের নগদ পয়সা যা ছিল এক রকম শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ইনি চুঁচুড়ায় বাড়ী খরিদ না করে যদি পৈতৃক বাড়ীটার উপর ২৫০৲ কি ৩০০৲ টাকা ব্যয় করতেন, আর দু'হাজার টাকা ব্যয় করে নিজ পাড়াটুকুর স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করতেন, আর বাকী টাকায় ধানের জমি কিনতেন, তাহলে ছেলে পিলের অন্নের সংস্থান হয়ে যেত। তাঁরা আশা করেন বাড়ী ভাড়া দিলে, যে আয় হবে তাতে ছেলেদের বেশ চলে যাবে। এই সহজ কথাটা তাঁরা বুঝেন না হে, যে বাড়ীটা তিনি করে গেলেন তাতে ছেলেদেরই থাকবার স্থান হবেনা তা আবার ভাড়া দেবে? ছেলেরা ত সহরে বাস করে বেঁচে গেল কিন্তু কি খেয়ে থাকবে সে চিন্তা কি তাঁরা একবারও করেন? যদি সকলে সমবেত-ভাবে ইচ্ছা করেন তবে পল্লীগুলি সুখের আগার হতে পারে;

প্রত্যেক পল্লীর মধ্যে প্রত্যেকে যদি নিজের একমাসের আয় দান করেন তবে পল্লী সংস্কার অসম্ভব হয় কি ?'

'বাবাজি, তোমার কথা সকলই সমীচীন। ঐ সকল বিষয়ে সময়ান্তরে আলোচনা হবে। এখন বল দেখি তোমার এমন উৎকৃষ্ট চাকুরিটি পরিত্যাগ করা কি প্রকারে সমীচীন বলে মনে করেছ, তৎসম্বন্ধে আমাকে উত্তর দাও দেখি।'

'খুড়া মশায়, ব্রাহ্মণের চাকরী করা বিধি সম্মত ?'

'হাঁ বাবাজি! তোমার কথা সমীচীন সমীচীন। 'ন শ্ব-বৃত্ত্যা কদাচন!' তবে দেখ বাবাজি কালধর্ম্ম অনুসারে চলতে হবে 'ত ? আর আপদ্ধর্ম্ম হিসাবেই ত' বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ চাকরি স্বীকার করেছে।'

'আমরা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি বলেই এ সকল কষ্টভোগ করছি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপদ্ধর্ম্ম কি চিরদিন থাকে।'

'বাবাজি তোমার কথা সমীচীন সমীচীন। তবে সংসার ধর্ম্ম ত করা চাই, গৃহমেধীও হতে হবে, তখন জীবিকার্জ্জন কি প্রকারে হবে বল ?'

'আমাদের পিতৃপুরুষগণ কি চাকুরী করতেন ?'

'বাবাজি! তখনকার কথা ছেড়ে দাও। তখন দ্রব্যাদি এরূপ মহার্ঘ্য ছিল না আর বিলাসিতাও ছিল না। পৈতৃক জমিজমা হতে কোনও রকমে চলে যেত।'

'পূর্ব্বে যখন চলত, এখনও চলতে পারে। বিলাসিতা যদি

পরিত্যাগ করা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই চলবে। জিনিষপত্রের যেমন মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, তেমনি কৃষিজাত ফসলেরও মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে।'

'তুমি কি বাড়ী বসে কৃষিকার্য্য করার মনন করেছ বাবাজি ?'

'আজ্ঞে তা'তে ক্ষতি কি খুড়া মশায় ?'

'সর্ব্বনাশ ! অসমীচীন বাবাজি বড়ই অসমীচীন। আমি তোমাকে বিশটা নজির দেখাতে পারি যারা চাষ করে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে ! এই দেখ মাদার মিত্তির, শশি গোঁসাই, নগেন মুখুজ্যে।'

'যাঁরা চাষে অকৃতকার্য্য হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেককেই আমি জানি। এই যে নগেন কাকার কথা আপনি বললেন, উনি এখন কলিকাতায় থাকেন, তাঁর বাসায় আমি গিয়েছিলাম ও তাঁর সঙ্গে আমার চাষ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়েছিল। তিনি কিন্তু চাষে লোকসান হয় এমন কথা বলেন না।'

'চাষে যদি লোকসান না হবে, তবে সে দেনদার হয়ে বাড়ী পরিত্যাগ করে পলায়ন করল কেন ? সেও ত একটা মাথা পাগলা ছিল, তোমাকেও সেই রকম বিকৃত-মস্তিষ্ক করে দিয়েছে। দেনার চোটে বাছাধন পলায়ন করতে পথ পান-নি, শেষে মহাজনে বাটী পর্য্যন্ত নিলাম করে নিয়েছিল। মহাজন যেই ভাল লোক, তাই আমরা পাঁচজন মিলে একটা কিস্তিবন্দী করিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণকে বজায় রেখেছিলাম। আর ভাগ্যে একটা ভাল চাকরী জুটে গিয়েছিল তাই রক্ষে।'

'নগেন কাকা বলেছেন যে লোকসান হওয়াটা চাষের দোষ নয়, আমরা বিবেচনা করে চলতে জানিনে বলেই লোকসান দিই।'

'তবে তুমিও দেখ। রসময়, দেখ তুমি যেন ওর মধ্যে থেক না।'

রসময়—'না আমি ও সকলের মধ্যে কি জন্য যাব?

যতীন্দ্র—'না, খুড়া মশায়কে আমি এর মধ্যে চাইনে।'

গদাধর—'এক্ষণে চাষ আবাদ করাই কি ঠিক করেছ?'

যতীন্দ্র—'নগেন কাকা আমাকে কৃষিসম্বন্ধে কতকগুলো উপদেশ দিয়েছেন। আমি তাঁর উপদেশমত কয়েকটী ফসলের আবাদ করব, মনস্থ করেছি।'

'ওঃ সে ভারি বুজমান লোক আর কি? সে যদি চাষ বুঝত, তবে আর ও রকম দুরবস্থা হত না। আমার বিবেচনায় তার উপদেশমত কাজ করলে তোমারও তার মত দশা ঘটবে। তা' বাবাজি ঠেকেই শেখ, দেখে ত আর শিখলে না।'

'না খুড়োমশায়, তিনি অকৃতকার্য্য হয়েছেন সত্য কিন্তু তাহ দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। সে সময়ে যদি তাঁর অর্থাভাব না ঘটত, তবে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হতে পারতেন। অতএব তাঁর উপদেশমত চললে অপরে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হতে পারবে।'

'ভাল, সে অকাল-কুষ্মাণ্ডটা তোমাকে কি উপদেশ দিয়েছে বল দেখি?'

'তিনি আমাকে প্রথমে লাঙ্গল গরু রেখে চাষ করতে নিষেধ করেছেন আমাদের যে ত্রিশ বিঘে আমের বাগান আছে ঐ বাগানে আনারসের আবাদ করতে উপদেশ দিয়েছেন। অবশ্য ক্রমে ক্রমে ও সব করতে হবে। আর চার বিঘে জমিতে কলার চাষ করতে বলেছেন।'

'আহা! কি সমীচীন উপদেশটিই দিয়েছে। এটা যে বিকৃত-মস্তিষ্কের ফল তা সহজেই অনুমেয়। দেখ আমাদের পল্লীগ্রামে অত আনারস কে খাবে?'

'আজ্ঞে আনারস 'প্রিজার্ভ' করে অর্থাৎ চাটনীর মত রক্ষা করে অনেকদিন রাখা চলে ও শিশিতে বোঝাই করে দেশ বিদেশে চালান দিলে যথেষ্ট লাভ হয়। এরূপ ব্যবসা আমাদের দেশে অনেক লোকে করেছেন। ঐ রকমে আম নিচু প্রভৃতি অন্যান্য ফলও রক্ষা করে চালান দেওয়া যায়।'

'ভাল দেখা যাক্। তুমি যখন ঝোঁক ধরেছ, তখন ত' কারও সদুপদেশ গ্রহণ করবে না। কিন্তু বাবাজি তোমার ও-কাজ আমি সমীচীন বলে মনে করতে পারছি নে। যে কটা টাকা উপার্জ্জন করে এনেছ তা' জলে দেবে। প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে যেমন কোনও বাঁধ টিঁকতে পারেনা, তেমনি তোমার প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের কোন উপদেশই দাঁড়াতে পারবে না। রসময় ভায়া বুঝচ, এক্ষণে আমাদের মূক হয়ে থাকাই সমীচীন।'

রসময়—'গদাধর, তুমি এতক্ষণ বকে বকে শেষে যা' সমীচীন

স্থলে স্থির করলে আমি তা প্রথমেই স্থির করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছি।'

— ২ —

রসময় রায় আহ্নিক করিতেছেন এমন সময়ে বাহিরে অনবরত ঠক্ ঠক্ শব্দে বিরক্ত হইয়া তাঁহার ভ্রাতৃজায়া মোক্ষদা ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৌ ঠাকরুণ, বাইরে অমন ঠক ঠক করছে কে?'

'ও ঠাকুরপো মিস্ত্রি পাট প্রস্তুত করছে।'

'পাট কি হবে?'

'যতীন পাট তৈরি করাচ্ছে—তুমি যে এবার মাকে আনাতে চেয়েছ।'

'আর আমার মাথা চেয়েছি? এবার দেখছি ভিটেয় থাকা দায় হবে। যার জোরে মাকে আনতে চেয়েছিলাম, তা কি আমার আছে? পূজা করে দেনদার হয়ে শেষটায় কি খাবার এক মুঠো যা সংস্থান আছে তাও যাবে? এ সব অত্যাচার আর আমি সহ্য করতে পারব না বৌ ঠাকরুণ। আমাকে কাশী যেতে হল।'

'যতীন বলেছে পূজার খরচ সে নিজে দেবে। তোমাকে কিছু দিতে হবে না।'

'ভাল। চাষ করে যখন সবই উড়াবে তখন না হয় কিছু মার পূজাতেই যাক্—পরকালের কাজ হবে। কোন রকমে

হাতের টাকাগুলো শেষ হলে বাঁচি, তাহলে বাবাজীর লম্ফঝম্প ঘুচে যায়। তখন আবার এই বুড়োর কথামত' চলতেই হবে।

'ঠাকুরপো বিড় বিড় করে কি বকছ? পাগল হয়ে যাবে না কি?'

'বকছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। এমন চাকরিটে বৌ-ঠাকরুণ—কি আর বলব? দাদা ওকে আমার হাতে হাতে দিয়ে গিয়েছেন, আমিও জল আহার করে ওকে মানুষ করেছি। এমন করে মানুষ করলাম—শেষে কিনা এই হল!'

'ঠাকুরপো কি করব সকলই অদৃষ্ট!'

'বৌ ঠাকরুণ! আমি কাশী চলে যাব।'

'সে কি ঠাকুরপো! যতীন ছেলে মানুষ। যদি একটা নির্ব্বুদ্ধির কাজই করেই থাকে তবে কি তোমার তাকে ত্যাগ করে যাওয়া উচিত হবে?'

'কত আর সহ্য করব বৌ ঠাকরুণ? আমের বাগানটা কেটে তছনছ করে ফেলেছে। যেখানে দুটি ঘন গাছ আছে, সেখানেই কেটে ফাঁক করে ফেলেছে। বিয়ে থাওয়া করবে না, কেবল খাম খেয়াল নিয়ে আছে। কতদিনে যে বুদ্ধি শুদ্ধি হবে তা'ত বুঝতে পারছি নে।'

'তুমি কেন তাকে জোর করে বলনা, যে তুমি যা-বলবে—তাকে তাই শুনতেই হবে তাহলে কখনও সে আর তোমার অবাধ্য হতে পারবে না। সে ত' সে রকম ছেলে নয়।'

'তা যে আমি পারিনে বৌ-ঠাকরুণ। তার প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা দিয়ে তাকে চূর্ণ করতে যে আমার প্রাণ চায় না।'

'তবে আর আমার কাছে বলে ফল কি ঠাকুরপো?'

'আমি বুঝি যতীন ধীর, স্থির ও সুবোধ। সে একটা ভাল বুঝে কাজ করছে তা যে একেবারে নিষ্ফল হবে তাও সকল সময় মনে নেয়না; তবু এক এক সময়ে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনে। ছেলেমানুষ ত? যে ক টাকা উপায় করে এনেছে না হয় নষ্ট করবে। ঠেকে শিখলে আবার সুবুদ্ধি হবে, তখন একটা চাকরী জুটে যাবেই। আমি আর অধীর হবন বৌ ঠাকরুণ!'



অতি প্রত্যুষে গদাধর সাঙ্খ্য-বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় মাঠের দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ একটি কলাবাগানের নিকট উপস্থিত হইয়া পড়িলেন। এই কলাবাগানটি অতি সুন্দর; গাছগুলি সতেজ নধর ও কাণ্ডগুলি স্থূল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন এখানে কলাবাগান কে করিল? বাঃ সুন্দর সুন্দর কাঁদি পড়িয়াছে। কাঁদি গুলিই কি বৃহৎ। এরূপ বড় কাঁদিত তিনি কখনও দেখেন নাই। ঐ যে ভিতরে কে যেন রহিয়াছে। যতীনের মত বোধ হইতেছে যে? এ বাগানটা কিঁ যতীনের? তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে ওখানে? যতীন বাবাজি না কি?

যতীন্দ্র উত্তর দিল—'কি খুড়ো মশায় আপনি এখানে কোন দিক থেকে ?'

'আর বাবাজি, কর্ম্মভোগের এক শেষ। ভোলা মুচির কাছে কিছু খাজনা পাব—তা' যখনই আসি, তখনই সে বাড়ী থাকেনা। কি জঞ্জালেই পড়েছি। তাই মনে করলাম—আজ ভোরে গিয়ে বেটাকে ধরব—তা শুনলাম—বেটা তিন দিন হতে মহেশকুড়ো গ্রামে বিয়ে বাজাতে গিয়েছে। এখন এই মাঠ দিয়ে ফিরছিলাম। এই কলাবাগানটা দেখে মনে হল—এখানে বাগানটা করল কে ? তা বেশ বাবাজি—বড় সুন্দর বাগান হয়েছে দেখছি।'

'তা' সকলই আপনাদের আশীর্ব্বাদে খুড়া মশায়! যদি এসেছেন তবে ভিতরে এসে একবার পায়ের ধূলোটা দিয়ে যান। আপনার বাঁ দিক দিয়ে রাস্তা রয়েছে।'

গদাধর ভিতরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—'এ বাগান যে বড় সুন্দর করে ফেলেছ দেখছি! আর কি করেছ ?'

'চলুন আমার আনারসের ক্ষেতটা দেখাই গিয়ে। বাগানের ভিতরে যাই চলুন।'

'এ বাগান যে অতি পরিপাটি হয়ে গিয়েছে বাবাজি। সেবার আমের গুটি ধরলে রসময়ের সঙ্গে এসেছিলাম। তখন কি এর মধ্যে প্রবেশ করবার উপায় ছিল ? যত গো-বাঘা আর বুনো শুয়োরের আড্ডা ছিল। বাকী জঙ্গলটাও পরিষ্কার করিয়ে ফেল বাবাজি। সর্ব্বদা তোমাকে এখানে থাকতে হয়। বাঘ শুয়োরের আড্ডাটা চলে যাক।'

'ক্রমে সবটাই পরিষ্কার ক'রে ফেলব।'

'কতখানি জমিতে আনারস বসিয়েছ ?'

'আজ্ঞে এই দশ বিঘায় বসান হয়েছে।'

'কি ভাবে বসিয়েছ ?'

'প্রথমে জমির জঙ্গল গুলি গোড়া সমেত উঠিয়ে ফেলেছি—পরে মাটি বেশ করে কুপিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তারপরে আষাঢ় মাসে আনারসের পোয়া বা চারা সংগ্রহ করে লম্বালম্বি ভাবে এক হাত অন্তর সার দিয়ে দুটি লাইন প্রস্তুত করে তাতে একহাত অন্তর চারা বসিয়ে দিয়েছি। পরে দু'হাত জমি ছেড়ে দিয়ে ঐপূর্ব্বোক্ত লাইনের সহিত সমান্তরাল করে আর একটি লাইন প্রস্তুত করে তাতেও পূর্ব্বের মত এক হাত অন্তর চারা বসিয়ে দিয়েছি। এই রকম দু'হাত করে জমি ছেড়ে দিয়ে দুটো করে আনারসের লাইন বসিয়ে দিয়েছি।'

'আচ্ছা গত বৎসরে আনারস বসাও নাই কেন ?

'অত অল্প সময়ের মধ্যে আনারসের চারা সংগ্রহ হয়ে উঠেনি। তা' ছাড়া জঙ্গল পরিষ্কার করতে অনেক সময় লেগেছে। তাই গতবার কেবল কলা বসান হয়েছিল।'

'ও রকম বড় বড় কাঁদি ত বড় দেখতে পাইনা। ওগুলো কি কলা বাবাজি ?'

'আজ্ঞে ও গুলো চাঁপা কলা। ও এক এক কাঁদিতে অনেক ফলে। তাই ওর চারা সেওড়াফুলি প্রভৃতি জায়গা থেকে অতি কষ্টে সংগ্রহ করে এনেছি।'

'বেশ বেশ বাবাজি! তোমার ঐ কষ্ট করা সমীচীন, সমীচীন। সেধো মেধোর মত হাবি জাবি কলা না বসিয়ে যে ঐ কলা এনে বসিয়েছ—এটা বড়ই সমীচীন, বুঝলে বাবাজি বড়ই সমীচীন হয়েছে। আচ্ছা বাবাজি এই দশ বিঘে জমিতে আনারসের চারা বসাতে কত চারার আবশ্যক হয়েছে?'

'আজ্ঞে ষোল হাজার চারা লেগেছে।'

'এত চারা তুমি কোথা থেকে সংগ্রহ করলে?'

'যশোহর ও চব্বিশ পরগণার বড় বড় হাটে আনারস বিক্রেতাদের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছি। ওর জন্যে আমায় অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।'

'এখন আনারসের আর কি কি পাট করতে হবে?'

'এখন কেবল ঘাস আর আগাছা পরিষ্কার করে দিলেই চলবে—আর কিছু করতে হবে না। অবশ্য চার ধারে শক্ত বেড়া রাখতে হবে—নইলে গরুতে এসে সব নষ্ট করে দেবে।'

'কতদিনে আনারস ফল্‌বে?'

'সাধারণতঃ তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ষে আনারস ফলে।'

'আনারস ফললে কি সেখানে নূতন চারা বসাতে হবে?'

'আজ্ঞে না। আনারস ফল্‌লে ঐ গাছেরই পাশ দিয়ে ফড় বের হবে আর তার থেকেই আনারস জন্মাবে।'

'দুই লাইন করে চারা বসিয়ে—ছ'হাত করে জমি ছেড়ে দিয়েছ কেন? সব জমিতে চারা বসালেই হত।'

'তাহলে আম সংগ্রহ করার অসুবিধে হবে। আনারসের

গাছ জমে গেলে জঙ্গল হয়ে পড়বে; তখন আর তার মধ্যে আম কুড়ান চল্‌বে না।'

'যখন আনারস ফলতে আরম্ভ হবে, তখন এ দশ বিঘা থেকে বছরে কত টাকা তুমি পাবে আশা কর?'

'প্রতি বিঘাতে ষোলশ' করে আনারসের গাছ বসান হয়েছে। এর মধ্যে সব গাছই যে ঠিক হবে—এমন কথা নয়। সেজন্য ষোলশ গাছের মধ্যে ফি বিঘেয় হাজার আনারস আশা করা যায়। ফি আনারসটার দাম গড়ে এক আনা করে ধরলে হাজার আনায় ৬২॥০ টাকা। তার মধ্যে ঝর্‌তি পড়্‌তি বাদে বিঘেয় পঞ্চাশ টাকা খুব আশা করা যায়। তা হলে দশ বিঘেয় পাঁচশ টাকা আশা করা যেতে পারে।'

'বাবাজি সমীচীন সমীচীন! তোমার চাকরী ছাড়া সমীচীন হয়েছে। আমার বাগানটায় বাবাজি আগামী বর্ষে আনারসের চারা বসিয়ে দিতে হবে।'

'খুড়া মশায়! আসছে বছরে আপনার বাগানে আনারস বসিয়ে দেব। এ' ভার আমি গ্রহণ করলাম। আপনার ঐ বাগানটা দু'বিঘে নয়?'

'হাঁ দু'বিঘে কি আড়াই বিঘে হতে পারে। তোমার বাগান দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে। এখন থেকে প্রাতভ্রমণটা তোমার বাগানের দিকেই হবে। আর কিসের চাষ করছ বাবাজি?'

'আর কিছু করিনি। কলাবাগানের যে অংশটা এ বছর বসান হয়েছে সেই অংশটা দেখবেন চলুন।'

'বাবাজী এ' কলার ভুঁই না বেগুনের ভুঁই ?'

'আজ্ঞে এ জমিতে কলা ও বেগুন দুই ফসলই দেওয়া হয়েছে। এ বৎসর কলার ছোট চারা বইত নয়। কাজেই জমিতে বেগুন বসিয়ে তার মধ্যে মধ্যে কলার চারা বসিয়ে দিয়েছি—কলার জন্য আর পৃথক আবাদ করতে হয়নি।'

'বাহবা! কি সুন্দর কাল কাল বেগুন হয়েছে। বাবাজি সমীচীন। তোমার চাষ করা সমীচীন। এ কোন দেশী বেগুন বাবাজি ? এর বীজ কোথায় পেলে ? আমাদের দেশে এরূপ কাল ও এতবড় বেগুন দেখি নি।'

'এ বীজ নার্শরি থেকে এনেছি খুড়া মশায়। বৌবাজারে যে 'ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন' আছে সেইখান থেকে এনেছি। এর নাম 'চায়না ব্ল্যাক জায়েণ্ট।' সেদিন খুড়িমার কাছে কটা বেগুন দিয়ে এসেছিলাম।'

'হাঁ সেদিন বলেছিলেন বটে যে যতীন বেগুন দিয়ে গিয়েছে —বাজার থেকে আনবার প্রয়োজন নেই—তা' তিনি ত বেগুন দেখান নি। এমন সুন্দর বেগুন জানলে কি আর না দেখে ছাড়তাম ? আচ্ছা বাবাজি আজকাল কি পরিমাণ বেগুন হচ্ছে ?'

'দুদিন অন্তর তিন মণ করে বেগুন পাওয়া যাচ্ছে।'

'কি দর পাচ্ছ ?'

'আজ্ঞে প্রতিমণ তিন টাকা হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে।'

'ভাল ভাল ; আজ প্রাতভ্রমণটা হল ভাল। এখন থেকে এই দিকেই বেড়াতে আসব। এখন চললাম।'

'চলুন আমিও যাই। গোটাকতক বেগুন আপনার জন্য তুলে নিয়ে আসি একটু দাঁড়ান।

— ৪ —

রসময় বাবুকে ক্ষুণ্ণ মনে দাঁড়াইতে দেখিয়া মোক্ষদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন্—'ঠাকুরপো, বিমর্ষভাবে দাঁড়ালে যে। মেয়ে কেমন দেখে এলে ?'

'মেয়েত ভাল বৌ-ঠাকরুণ! কিন্তু দুঃখের কথা কি আর বলব—আমাদের বি, এ, পাশ ছেলে, তবু চাষের কথা শুনে তারা অমত করেছে। সে মেয়ের মা বলেছে ছেলে বি, এ পাশ হলে কি হবে—চাকুরী করেন না, কিছুনা। ও রকম মাথা পাগল ছেলেকে মেয়ে দেওয়া হবে না! তাঁর মেয়ে ধান সিদ্ধ গোবর নেদি প্রভৃতি নীচ কাজ করতে পারবে না।'

'আ মর মাগী। আমার এমন সোনার চাঁদ ছেলে—পছন্দ হলনা। দিকগে গোলামের সঙ্গে বিয়ে—আমার ছেলে কারও গোলাম নয়। আমি একটি চাষার মেয়ে দেখেই বিয়ে দেব। প্রথমে মনে হয়েছিল—এখন চাকরী ছেড়ে দিল। তখন মনে মনে কত দুঃখ করেছিলাম। এখন বুঝতে পার্‌ছি বেশ করেছে—চাষ করেছে। চাঁদ মুখখানিত সর্ব্বদাই দেখতে পাচ্ছি। দূর দেশে চাকরী—খরচেই সব যায়। শুনতেই মোটা মাইনে। যতীন বলছিল এ বছর চাষে বারশ' টাকা লাভ হয়েছে। ঘরে বসে আর কি চাই? যা' পেয়েছে, সেই ভাল; ক্রমে আরও

উন্নতি হবে। ঠাকুরপো আর বড় লোকের মেয়ে দেখতে যেওনা, একটা গরীবের মেয়ে দেখে সম্বন্ধ ঠিক কর।'

'আমিও তাই ভাবছি। একটী সুন্দরী দেখে গরিবের ঘর থেকে নিয়ে আসব যে কোন কথা শুনতে হবেনা। যতীন যা করেছে—এমন কজন লোক করতে পারে? কত লোক চাষ করে ফেল মেরে গিয়েছে—কিন্তু যতীনের চাষে প্রতি বৎসরই লাভের অংশ বেড়ে যাচ্ছে।'

'সকলেরই যদি লোকসান হয় তবে যতীনের লাভ হচ্ছে কি করে?'

'যতীনের চাষ ত সাধারণের মত নয়। কলার চাষ করেছে তাতে হাজা শুখা নেই। বার মাসই কলা হচ্ছে। ওতে মোটা লাভ। আমাদের সেই আম বাগানটার সবটাতেই আনারসের গাছ বসিয়ে দিয়েছে। ঐ সমস্ত গাছে যখন আনারস ফলবে, তখন একটা বাঁধা আয় দাঁড়াবে। অত আনারস আমাদের এদিকে বিক্রী হবেনা বলে আমাদের ননীকে চাটনীর কারখানায় কাজ শিখ্‌তে দিয়েছে। সে ঐ কাজ শিখে এলে আমাদের বাগানের আম ও আনারস দুই জিনিষই আরক দিয়ে শিশির মধ্যে পুরে বিলাতে চালান দেবে। এ সবই নগেনের পরামর্শ মত হচ্ছে। নগেন লোকটা এমন বুদ্ধিমান কিন্তু নিজে কিছু করতে পারে নি?'

'নগেন এমন বুদ্ধিমান তবে নিজে ফেল মেরে গেল কেন?'

'মূলধনের অভাব—তাতে সংসার ঘাড়ে কাজেই পারলেনা। যতীনকে ত আর সংসারের ভাবনা ভাবতে হয়না।'

— ৫ —

'আসুন কাকাবাবু—হঠাৎ যে এখনে?' যতীন নগেন বাবুকে প্রশ্ন করিল।

নগেন বাবু উত্তর দিলেন—'অনেক দিন এদিকে আসিনি কিনা তাই মনে করলাম বড় দিনের ছুটিটা একবার ঘুরে আসি।'

'এখন তাহলে আসুন। আমার ক্ষেতগুলো আপনার উপদেশ মত ঠিক আবাদ হয়েছে কিনা দেখুন।'

'খুব পেরেছ। আমি নিজে ও রকম পারতাম কিনা সন্দেহ। এখন কণ্ডিমেণ্টের কারখানাটা খুলে ফেল। ননীকে জিজ্ঞাসা করেছি—সে কাজ শিখে নিয়েছে। এখন কারখানা করলে চলতে পারবে। তোমার বাগানের আম ও আনারস নিয়েই কাজ আরম্ভ করতে হবে।'

'এ কাজ কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর করছে। আমরা শুধু প্রস্তুত করে কলকাতায় আপনার নিকটে পাঠিয়ে দিয়ে খালাস।'

'সে আমি দেখে নেব। তোমাদের কি করে খাটাতে হবে তা আমি জানি; পরিশ্রমে ত তোমরা পশ্চাৎপদ হবে না?'

'নিশ্চয়ই না।'

'চলো এখন বাড়ী যাওয়া যাক্।'

'আমার ক্ষেত দেখবেন না?'

'না এখন দেখবার আর সময় নেই। এই ২টার ট্রেণেই ফিরতে হবে। সেবার এসেত সবই দেখেছি, নূতন কিছুত আর করা হয়নি। চল যেতে যেতেই কথা হবে। আচ্ছা এ বছরে কি নতুন কলা বসিয়েছ?'

'হাঁ বসান হয়েছে।'

'পুরাণ বাগানে ঝাড়ের গোড়ায় গোড়ায় যে খেজুর গাছ বসান হইয়াছিল তা' ক'বছর হল?'

'আজ্ঞে পাঁচ বছর।'

'তবে আর দু'বছর পরেই ওর থেকে রস পাওয়া যাবে— কি বল?'

'আশা করা যায়।'

'নতুন কলাবাগানেও ত খেজুরের গাছ বসিয়ে দিয়েছ?'

'আজ্ঞে তা' দেওয়া হয়েছে।'

'এই দু'বছর পরে পুরাণ কলা-বাগান উঠিয়ে দিলেই তোমার চার বিঘে খেজুর বাগান হয়ে যাবে। এই রকম করে একটা করে কলা বাগান উঠে যাবে আর একটা করে খেজুর বাগান বের হয়ে পড়বে। আচ্ছা এ বছর কি কি ফসল করছ?'

'এ বছর ত্রিশ বিঘে বাগানের মধ্যে যেটুকু আনারস বসাতে বাকী ছিল তা' বসান হয়েছে। আক এক বিঘে, মান কচু দু'বিঘে আর তার মধ্যে জল দাঁড়ার পাশে কতকগুলো কপি

দিয়েছি। আর নতুন কলা-বাগানের মধ্যে দু-বিঘে বেগুন আর দু-বিঘে লঙ্কা দেওয়া হয়েছে।'

'তোমার আট বিঘে কলাবাগান হয়ে পড়ল। এখন আর তোমার কেনা লাঙ্গলে চল্‌বে না। বোশেখ মাসে ঐ আট বিঘে জমি চাষ দিতে হবে, তখন অত লাঙ্গল কোথা পাবে? আমার বিবেচনায় এ বছরে একখান লাঙ্গল করে ফেল। দুটো বলদ কেনো ভাল দেখে—তার প্রত্যেকটির যেন সওয়া শ' দেড়শ টাকা দাম হয়। অল্প টাকায় গরু কিনে তা দিয়ে চাষ করা বড়ই ভুল। ঐ গরুর জন্যে বেশ বলিষ্ঠ ও কার্য্যদক্ষ কৃষাণ দরকার। তার মাইনে বেশী করে দিও কিন্তু। আর একটা কথা বোশেখ মাসে কলার আবাদ শেষ হলে গরু কৃষাণের কোনই কাজ থাকবে না, সুতরাং তখন হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ করা সুবিধে। আসছে বছরে দশ থেকে ষোল বিঘে পর্য্যন্ত হৈমন্তিক ধানের আবাদ করতে পার—এতে তোমার ভাতের যোগাড় হয়ে যাবে। একটা বিষয়ে তোমাকে সতর্ক করে দিয়ে যাই—দেখ যেন আউস ধান বা পাটের আবাদ করে বসোনা, তাহলে তোমার কলাবাগানের আবাদ হবে না, সব নষ্ট হবে। তবে শুধু তোমার দড়াদড়ির জন্য পাঁচ দশ কাঠা পাট দিতে পার। কলার আবাদ শেষ না হলে লাঙ্গল অন্য কোনও কাজে লাগাবে না। সে বিষয়ে আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও।'

'আমি কি কখনও আপনার উপদেশ অবহেলা করেছি?'

'সেই জন্যই উন্নতির পথে চলেছ। আমি জানি তুমি আমার উপদেশ মত কাজ করবে। কিন্তু তবুও আমার মনে উদ্বেগ হয় পাছে তুমি সাধারণ চাষের কথা শুনে ভুল যদি করে বস।'

'আপনি সেজন্য উদ্বিগ্ন হবেন না।'

'দেখ, তোমার চাষের লক্ষ্য থাকবে একটা পাকা ফসলের দিকে। যেমন—খেজুর বাগান। আমিও তোমাকে আম বাগান করতে এতদিন উপদেশ দিতাম কিন্তু তোমার ত্রিশ বিঘে আমের বাগিচা আছে—তাই বলিনি। ঐ খেজুর গাছ প্রস্তুত করতে অনেক সময় লাগে সেজন্য তার মধ্যবর্ত্তী হচ্ছে—কলাবাগান। এ বছর থেকে প্রত্যেক বছর দু'বিঘে করে কলা-বাগান বসাবে আর সঙ্গে সঙ্গে খেজুর গাছও বসাবে। ভাল কথা মনে পড়েছে—একটা পাতিলেবুর বাগান কর। কলকাতায় পাতি লেবুর খুব দর।'

'আচ্ছা এবার যে দু'বিঘে কলা বসাতে বলেছেন ঐ দুই বিঘেয় খেজুরের চারা না বসিয়ে কলকাতা থেকে লেবুর কলম এনে বসালে হয়না?'

'বেশ সেই ভাল। দেখ এই যে বলদ কেনা হবে, তার দেখা শুনার জন্যে একজন রাখাল দরকার। সুতরাং তুমি দুটো গাইও রাখবে—তাতে দুধের যোগাড়ও হবে সারের যোগাড়ও হবে।'

'গাইত আছে কাকাবাবু। উপস্থিত তিনটে আছে। তাদের

যত্নের কোনও ত্রুটী হয়না। মা নিজে দেখেন আমিও দেখি।' 'চাকরের উপর নির্ভর করলে কোনও কাজই ভাল হয়না। চাকরে কাজ করবে, নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। দেখ তোমার সঙ্গেত ভাল করে কথাবার্ত্তা হলনা—তুমি কেন আমার সঙ্গে চলনা।

'আচ্ছা ; চাষ সম্বন্ধে আমারও কতকগুলো কথা আছে। একবার ঘুরেই আসা যাক। কিন্তু আমি ভুদিন বই থাকতে পারব না ; নইলে ভুঁয়ের বেগুনগুলি সব পেকে যাবে।'

'আচ্ছা তাই হবে।'

— ৬ —

নগেনবাবু তাঁহার কলিকাতার বাসায় উপস্থিত হইয়া দরজার কড়া নাড়িতেই একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কিশোরী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং যতীনকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া নগেনবাবু বলিলেন—'রাণি, এঁকে তোমার লজ্জা করতে হবে না ; যতীন আমাদের ঘরের ছেলে। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতেই নগেনবাবুর স্ত্রী ঊষা আসিয়া যতীনকে কুশল প্রশ্ন করিলেন—যতীনও প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। নগেনবাবুর ছেলেমেয়েগুলি যতীন-দাদা আসিয়াছে শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। নগেনবাবু চা প্রস্তুত করার জন্য আদেশ করিলেন।

নগেনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেশ বলিল—'যতীনদা, আমি তোমার সঙ্গে বাড়ী গিয়ে চাষ করব, আমাকে জমি সংগ্রহ করে দিতে হবে।'

যতীন উত্তর দিল—'তোমাদের ত জমি আছে। কাকা যে সকল জমি নিয়ে চাষ করেছিলেন, তাতেই হতে পারবে। তবে এখন তাড়াতাড়ি কিসের জন্য। এখন পড়াশুনা কর পরে চাষ করলেই চলবে।'

'লেখা পড়া শিখে আর কি করব? ঐ দেখনা কালু বাবু বি,এ পাশ করে চাকরী পেলে না, ঘরে বসে আছে। বাবা ত আমাকে চাকরী করতে দেবেন না, তখন যত শীঘ্র পারা যায় কাজে লেগে যাওয়াই ভাল।'

নগেন বাবুকে সম্বোধন করিয়া যতীন কহিল—'কাকা আপনি কি সুরেশকে পড়া ছেড়ে দিতে বলেন?'

'ম্যাট্রিকুলেশনটা যখন পাশ হয়েছে, তখন আর পড়ে কি হবে? Business এর পক্ষে ঐ যথেষ্ট। তবে আমি ওকে পড়া ছাড়তে বলিনি। সুরেশ নিজেই ননীর সঙ্গে কণ্ডিমেণ্টের কাজ শিখতে আরম্ভ করেছে।

'কই কাকা এ কথা ত আমায় আগে বলেন নি।'

'ঐ বা আর কদিন আরম্ভ করেছে? তবে ওকে তোমাদের সঙ্গে লাগিয়ে দেবার অভিপ্রায় আমার বরাবরই আছে। তোমরা ত আমাকে জড়াবেই—তা সুরেশই যাক্। তোমাদের ও আমার সাহায্য পেলে সুরেশ নিশ্চয়ই উন্নতি করবে।'

'অই ভালো কাকাবাবু। আপনি সকালে বিকেলে দেখবেন। চাকরীটে এখন ছেড়ে কাজ নেই।

'তাই হবে। পুঁটির বিয়েটা আগে দিয়ে ফেলি। তারপর আমিও নেমে পড়বো।'

বলিয়াই তিনি রাণীকে প্রশ্ন করিলেন—'রাণি চা হয়েছে ?'

'এই নিয়ে যাই'—রাণী উত্তর দিল।

নগেন বাবু যতীনকে পুনরায় কহিলেন—'যতীন তুমি রাণীকে কখনও দেখনি। ও আমার ভাগিনেয়ী—আমার ছোট বোন সরসীর মেয়ে।'

এমন সময়ে রাণী চা লইয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল ও সকলকে এক এক কাপ করিয়া চা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

নগেন বাবু প্রশ্ন করিলেন—'কেমন চা হয়েছে যতীন ?'

'বেশ হয়েছে।'

'হ্যাঁ রাণী সব কাজেই বেশ পটু। রাঁধতেও খাসা শিখেছে।'

'রাণীর বিয়ে কোথায় হয়েছে ?'

'বিয়ে এখনও দেওয়া যায়নি। সরসীর অবস্থা তত ভাল নয়। আজকাল টাকা নইলে ত আর কেউ কথা কননা। কাজেই দেরী পড়ে যাচ্ছে। সেদিন একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর ছেলের জন্যে রাণীকে দেখতে। ছেলেটী বি, এ পাশ করে রেলের অডিট অফিসে ২৫৲ টাকা মাইনের কেরাণী। তাঁর রাণীকে পছন্দ হল না।'

'কেন ? এমন সুন্দরী মেয়ে পছন্দ হ'লনা কেন ?'

'মেয়ে কি আর পছন্দ হয় নি। আসল কথা মনের মত টাকা হলনা, তাই পছন্দও হল না।'

'ওরা অর্থ-পিশাচ। সমাজও তেমনি ওদের অর্থ নেবার প্রবৃত্তিকে বেড়ে যাবার সুযোগ দিচ্ছে। আমার কি মনে হয় জানেন—এই সকল অত্যাচার নিবারণের জন্য স্ত্রী-স্বাধীনতার দরকার। মেয়েরা যদি কোনদিন একযোগে পুরুষের সঙ্গে নন্-কো-অপারেশন করতে পারে, তাহলেই এ সবের প্রতিকার হতে পারে। নইলে নয়।'

'আচ্ছা যতীন তুমি এখনও কেন বিয়ে করছ না ?'

'আর দিনকতক পরে, কাকাবাবু; এই কণ্ডিমেণ্টের কারখানাটা চলতে থাকলে আর ভাবনা নেই।'

'এখন যা করে তুলেছ তাতেই বিয়ে করতে পার। তোমার মাসিক আয় ত এখন একশ টাকা দাঁড়িয়েছে। আর তার উপর এখন যদি তুমি বিয়ে কর। আমারও একটু উপকার করা হয়।'

'কেমন করে ?'

উহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে নগেনবাবু পুটিকে পান আনিবার অছিলায় এবং অন্যান্য সকলকে অন্যান্য কাজে পাঠাইয়া দিলেন ও অবশেষে কহিলেন—'উপকার আর কি বাবাজি ? এই মনে কর তুমি যদি রাণীকে বিয়ে কর, তাহলে আমরা এই এত বড় একটা দায় হতে উদ্ধার হয়ে যাই। আর যদিও আমরা তোমায়

স্বরেশের মতই স্নেহ করি তবুও একটা রক্তের বাঁধন পড়ে গেলে বেশী আনন্দের কথা নয় কি?'

'আমি বরাবর আপনার উপদেশমতই চলে আসছি। কিন্তু এ বিষয়টায় ত আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই, মা ও কাকার মতের উপর অনেকটা নির্ভর করছে।'

'সে সম্বন্ধে মত-দ্বৈধ নাই। তাঁদের দুজনেরই এতে খুব মত আছে। বৌ-ঠাকুরুণ অনেকবার রাণীকে দেখেছেন। তিনি রাণীকে খুব পছন্দ করেছেন আর রসময়দা'ও মত করেছেন। কেবল তোমাকে একবার আমার দেখান কর্ত্তব্য বলে মনে করি তাই—'

আমাকে দেখাবার এমন কি আবশ্যক ছিল কাকাবাবু। কুরূপা হলেও আপনার স্নেহের দান আমি আদরেই গ্রহণ করতাম। আর এত—'

যতীন কথাটি শেষ করিতে পারিল না। লজ্জায় তাহার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল।

আমাদের প্রকাশিত

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

প্রণীত কয়েকখানি পুস্তক

১। **ব্যথার সুখ** ... ... মূল্য ১॥০

বঙ্গবাসী বলেন—"প্রারম্ভ বড়ই সুন্দর। সেই প্রারম্ভ—ভিত্তির উপর ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে বিভিন্ন চরিত্রের সমবায়ে এবং সংঘর্ষে এই উপন্যাস পুস্তক রচিত। বিদ্যারত্নের চরিত্র অতীব সমুজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হাসি, কণক, সুধাংশু সনত, সরোজ প্রভৃতি পারিবারিক ঘটনা সংযুক্ত অনেকেরই চরিত্র যথাযোগ্যরূপেই চিত্রিত হইয়াছে। ঘটনা চিত্রণ অতীব স্বাভাবিক; যেমন রেল-ষ্টেশনে জেণ্টালম্যানস ওয়েটিংরুমে এ দেশীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর অবমাননা, বৃদ্ধ বিদ্যারত্নের সৎ শিক্ষায় বাল-বিধবা হাসির শাস্ত্রাদিষ্ট বৈধব্যাচার গ্রহণ অথচ পিত্রালয়ে অল্প শিক্ষা প্রাবল্যে তাহার বাধ্যতামূলক আংশিক পরিবর্ত্তন ইত্যাদি। ভাষা অতীব মনোহারিণী, ভাব গভীর অথচ মধুর কবিত্বময়ী। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ বহু-পরিমাণে সম্ভবপর ইহাই আমাদের ধারণা।"

২। ঘরে পরে ... ... মূল্য ১।০

প্রবীণ সাহিত্যিক প্রবর স্বর্গগত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত—

"* * * আপনি একটি মহান আদর্শকে মহিমান্বিত করিয়া ধরিয়াছেন। * * কিন্তু এ সাধু পরামর্শ দেশের লোকে গ্রহণ করিবে কি? কিন্তু আমি সকলকে পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি।"

৩। ভুল ... ... মূল্য ১৲

প্রবাসীর সুযোগ্য সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন

'আপনার হাত অতি মিষ্টি, লেখা ঝরঝরে। লহরীর চরিত্র বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।'

৪। নিরক্ষরা ... ... মূল্য ১॥০

পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। একেবারে টাট্‌কা। সবে বাহির হইয়াছে।